লৌকিকতার পরিবর্তে

বহুরূপী

পূর্ণ ও
৮এ, টেমা
কলিকা

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

প্রচ্ছদ :
বিশ্বাস

আর বলেন কেন! যেমন নাছোড়বান্দা আমার ঘরের মেয়েছেলেটি, ঠিক তেমনি হয়েছে আমার পুস্তক প্রকাশক মানিক বিশ্বাস। দুই-ই সমান।

কথা নেই, বার্তা নেই, হুট্ করে টেলিফোন এসে হাজির। বলে কিনা, নতুন বই দিন।

আমি অবাক। বলে কি! এই তো সেদিন বই দিলাম, এরি মধ্যেই আবার বই! অসম্ভব। ওসব আমার কাছে নেই।

—লিখে ফেলুন…

—পারব না। কিছুতেই পারব না…

—পারতেই হবে…

—মানে! আবদার নাকি! ওসব হবে-টবে না আমার দ্বারা…

—মাত্র চারদিন সময়…

—তা আমি কি করব! আমার দ্বারা ওসব…

—বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে—

—বয়ে গেল। আমি ওসবের মধ্যে নেই…

—লাস্ট ডেট্ শনিবার··

—ওরে আমার কে রে! ভারি আমার হুকুম-দেনেওয়ালা এসেছেন। ওসব আমার দ্বারা হবে-টবে না আগেই বলে রাখছি…

—বেলা দুটোর মধ্যে, নইলে…

—নইলে কি! খুন করবে, না ফাঁসি দেবে! ঠিক আছে, দেখা যাক। তবে আমার সাফ কথা—পারব না। কিছুতেই না। এই যাঃ! লাইন কেটে দিয়েছে।

এখন উপায়! কোথায় পাব আমি এখন নতুন বই! তাছাড়া

এসব কি সোজা ব্যাপার। প্লট রে—ক্লাইমেক্স রে—হেন রে—তেন রে—সে এক এলাহি কাণ্ড। একি চাট্টিখানি কথা।

অবশ্য নামী লেখকদের কথা আলাদা। একটা কেন, দিনে বিশটা লেখা শেষ করতেও তাদের কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু অত ঘন ঘন প্রসব করা কি সবার পক্ষে সম্ভব?

অথচ লিখতেই হবে। নইলে,…নইলে যে কি হবে, সে কি আর বুঝতে বাকি আছে। একটা-না-একটা ফ্যাকড়া তুলে ঠিক পেমেণ্টটা চেপে দেবে। চিনতে তো আর বাকি নেই কাউকে।

কিন্তু কি লিখব। যা তা একটা কিছু লিখলেই তো হল না। প্লট কোথায়।

তবু একসময়ে বসে গেলাম কাগজ-কলম নিয়ে। দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সব বৃথা। হাজার চেষ্টা কবা সত্ত্বেও কিছুই লেখা গেল না। একটা লাইনও না। এখন উপায়।

বাঁচিয়ে দিল কমেডিয়ান বন্ধু বলাই। বলাই অবশ্য তার আসল নাম নয়, তবু এ কাহিনীতে আমি তাকে বলাই বলেই উল্লেখ করব। বলাইয়ের নির্দেশ তাই।

মজার ছেলে বলাই।

আসে সে বাড়ি কাঁপিয়ে। হাসে গলা ফাটিয়ে। এমন কি যেখানে কাক-চিল পর্যন্ত নাক গলাতে সাহস করে না, সেখানে পর্যন্ত তার সেই একই চেহারা। কোন্ দেবতাকে কি করে তুষ্ট রাখতে হয়, বলাই তা ভাল করেই জানে।

আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। বাড়িতে পা দিয়েই সে গলা ফাটিয়ে হাঁক দিল, কইরে ভণ্টে, ঘণ্টে, মণ্টে, নণ্টে, ভুটকি, মুটকি, চুটকি, ফুটকি, ছুটকি, বিচ্ছু, পায়রা, শালিক, লঙ্কা, পিপড়ে—তোরা সব গেলি কই। বৌঠাইনরে খবর দে যে, বলাইকাকু আইছে। এই যে বৌঠাইন।

শ্রীমতীকে দেখেই আচমকা এক খাবলা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আবার সরব হয়ে ওঠে বলাই।

—এই যে বৌঠাইন। আপনের কথাই কইতে আছিলাম। কেমন আছেন কন? বহুরূপী কই?

—ঘরেই আছেন। নিমেষে গলে একেবারে জল হয়ে গেলেন শ্রীমতী, তা অ্যাদ্দিন দেখিনি কেন ঠাকুরপো?

—বাইরে খ্যাপ্ মারতে গেছিলাম।

—তাই বল। যথাযোগ্য আপ্যায়ন সহকারে শ্রীমতী এবার বলাইকে নিয়ে এলেন আমার ঘরে, নাও, বস এখানে। তারপর হঠাৎ কি মনে করে বল?

—খ.র কন্ ব্যান। একখান আকাম কইরা ফালাইছি বৌঠাইন। অখন উদ্ধার করেন।

—আকাম! শ্রীমতী অবাক, আকাম মানে?

—মানে বিয়া কইরা ফালাইছি।

—বিয়ে! সেকি! কই, আগে কিছু জানালে না তো?

—আকাম কি কেউ জানাইয়া-শুনাইয়া করে যে আগে জানামু? তাই চুপে চাপেই কর্ম্ম সাইরা ফালাইছি। ?? মনের সতেরোই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৌভাত। মার্কেটিং-টার্কেটিং কিছু করতে চান তো আগের দিনই সব সাইরা ফালাইয়েন। এই নেন দুইখান কার্ড।

—দুখানা মানে? এবার অবাক হবার পালা আমার।

—করতেই যখন হইব, তখন আমি আর শঙ্কর, আমরা দুই বন্ধু, একই দিনে, একই জায়গায়, একই খরচে কামটা চুকাইয়া ফালাইলাম।

—শঙ্কর মানে? শ্রীমতীর প্রশ্ন গাইয়ে শঙ্করের কথা বলছ?

—তবে আর কে! যাউক, অখন একখান কামের কথা কই। আমার কিন্তু কেউ নাই বৌঠাইন। শঙ্করেরও ঠাকুর চাকর ছাড়া কেউ নাই। তাই আপনেরে কিন্তু একটু তাড়াতাড়িই সেদিন যাইতে

হইব। ভাল-মন্দ বেবাক দেখাশোনা করনের ভার আপনের। একেবারে সব কাম চুকাইয়া দিয়া তবে আপনের ছুটি।

—ঠিক আছে, তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তাড়াতাড়িই যাবো'খন।

—বাস, ঝামেলা মিটে গেল। শঙ্কর তো ভাইবাই অস্থির। কয় যে, এতবড় কাম, এইসব দেখাশোনা করে কে! আমি কইলাম যে, ক্যান্, আমাগো বৌঠাইন থাকতে ভাবনা কি! যাউক, অখন আপনারে চুপে চুপে একখানা কথা কই বৌঠাইন···

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন শ্রীমতী। কি ব্যাপার! কি বলতে চায় বলাই!

—কইছিলাম বউটার কথা। একেবারে পোলাপান। সংসারের ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না। একটু ভাল কইরা শিখাইয়া-পড়াইয়া দিয়া আইসেন। ঝগড়াঝাঁটি না কইরা আপনাগো দুইজনের মত যেন চিরকাল মিলামিশা থাকতে পারি।

—ঠিক আছে। অভয় দিয়ে বললেন শ্রীমতী, তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ব্যস নিশ্চিন্ত। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বলাই, অনেকক্ষণ প্যাচাল পাড়ছি। অখন এককাপ গরম গরম চা খাওয়ান। সঙ্গে আর কিছু দিতে হইব না। নেহাত যদি দিতে চান তো খানদুয়েক বিস্কুট দিলেই হইব।

—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। শ্রীমতী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

—মতলবটা কি শুনি? এতক্ষণ বাদে বলাইকে একা পেয়ে বললাম, ওসব হবে-টবে না তা আগেই বলে দিচ্ছি তোকে। আমি যাব না তোর বৌভাতে।

—যাবি না মানে! লাফিয়ে উঠল বলাই, চালাকি পাইছস নাকি! আলবৎ যাইতে হইব।

—অসম্ভব।

—তার মানে? বলাই হতভম্ব।

—মানে মাসের শেষ। তাছাড়া একটা নয়, এক সঙ্গে দু-দুটো বৌভাত! উঁহু, সম্ভব নয়। টাকা নেই।

—তোর আবার টাকার ভাবনা কি! বলাই অবাক, পাবলিসার মানিক বিশ্বাসের কাছ থিকা চাইয়া নে।

—সে-গুড়ে বালি। একটু আগেই ফোনে কড়া নোটিস দিয়ে দিয়েছে।

—নোটিস! বলাইয়ের দুচোখে অর্থহীন দৃষ্টি।

—হ্যাঁ নোটিস। বলেছে, টাইমলি নতুন বই সাবমিট করলে তবেই টাকা, নইলে নো হোপ।

—তা বইয়ের জন্য ভাবনা কি? যা মনে আসে লেইখা ফালা।

—কি করে লিখব? প্লট কোথায়?

—প্লট! তাচ্ছিল্য সহকারে জবাব দিল বলাই, ঐ জন্যই তো তোর কিছু হইল না।

—মানে! বিরক্তিভরে তাকালাম বলাইয়ের দিকে।

—মানে তোর মাথা আর মুণ্ডু। সাধে কি আর বৌঠাইন তোরে রাইতদিন গাইলমন্দ করে। ঐ জন্যই তো।

—কি বলতে চাস?

—কইয়া লাভ নাই, তোর মোটা মাথায় কিছুই ঢুকব না। নইলে এই যুগে কেউ আবার প্লট লইয়া মাথা ঘামায়। ওসব আছিল শরৎবাবুর যুগে। অখন সব প্রোগ্রেসিভ ব্যাপার। গল্পে প্লট থাকা অখন ব্যাকডেটেড্ ব্যাপার।

—তাহলে কি থাকবে? প্রশ্ন করলাম বলাইকে।

—কথা। স্রেফ কথা। কথার পর কথা। তার উপর কথা। কেউ যাতে মানে খুঁইজা না পায়, এমন সব প্যাঁচমারা কথা। তার লগে একটু ককটেল পাঞ্চ। ব্যস, হইয়া গেল গল্প।

—ককটেল পাঞ্চ! অবাক হয়ে চাইলাম বলাইয়ের দিকে, সে আবার কি?

—খিস্তি।

—খিস্তি! চমকে উঠল্লাম বলাইয়ের কথা শুনে।

—হ্যাঁ খিস্তি। যেমন-তেমন খিস্তি না, কাঁচা খিস্তি।

—কি বলছিস এসব কথা! প্রতিবাদ করলাম বলাইয়ের কথার।

—ঠিকই কইছি। সত্য কিনা ভাল কইরা মিলাইয়া দেখ। মিথ্যা হইলে তখন আমারে কইস। কাজেই যদি ভাল চাস তো বাজে ধানাই-পানাই ছাইড়া দিয়া এইসব প্রোগ্রেসিভ ব্যাপার লেখতে শুরু কর।

—কি করে তা সম্ভব? হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো।

—আরে মর! পিন-আঁটা পত্রিকাওয়ালাদের মত খোলাখুলি-ভাবে লেখবি ক্যান। লেখবি বেশ কায়দা কইরা নীতিবাগীশ সাইজা। সেই সঙ্গে গম্ভীরভাবে 'জীবন-যন্ত্রণা', 'যুগ-যন্ত্রণা' ধরনের কয়েকটা লাগসই ধরনের কথা বসাইয়া দিবি—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এ ক্লাস মহৎ সাহিত্য। চাই কি প্রাইজও জুইটা যাইতে পারে কপালে থাকলে।

—আমার দ্বারা এসব সম্ভব নয় ভাই। ভয়ে ভয়ে বললাম, চিনিস তো তোর বৌঠাইনকে…

—এইটা অবশ্য তুই ঠিকই কইছস! যা মুখ। ঐ মুখ একবার ছুটলে—এই চুপ! চুপ! আইতে আছে। আসেন বৌঠাইন। আপনের কথাই কইতে আছিলাম। চা আনছেন বুঝি! দেন আমার হাতে।

চা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী আবার পা বাড়ালেন হেঁসেলের দিকে। হেঁসেল ফেলে তুদণ্ড এখানে দাঁড়ানোর মত সময় সত্যিই তখন ছিল না তার।

—আঃ। চায়ে চুমুক দিয়ে আবার মুখ খুলল বলাই, তাইলে কি ঠিক করলি। বৌভাতে যাওনের ইচ্ছা নাই তোর?

—কি করে যাব তুই-ই বল। বিপন্নের মত বললাম, লেখাটা শেষ করতে পারলে তবু না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু প্লট না পাওয়া পর্যন্ত…

—কি রকম প্লট চাস কইয়া ফালা।

—খানিকটা মধ্যবিত্ত ধরনের, মানে…

—মানে ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট হাসি, থার্টি পার্সেণ্ট চোখের জল, টেন পার্সেণ্ট ক্লাইমেক্স, আর বাদবাকি সব মিলে টেন পার্সেণ্ট পাঞ্চ করা গল্প চাস—এই তো?

বোকার মত তাকিয়ে রইলাম বলাইয়ের দিকে। কি বলতে চায় ও।

—বুঝলি না? বেশ, তাহলে সোজা কইরা কই। প্রথমে আলাপ, তারপর লটর-পটর, তারপর চোখের জল, সব শেষে বিয়া, এই তো চাস? ঠিক আছে, তাইলে আমার বিয়ার কেচ্ছার কাহিনী লেইখা ফালা। খারাপ হইব না। জমব ভাল। কিন্তু একটা কথা। টাকাটা কিন্তু পুরা আমার বৌভাতে খরচ করতে হইব। ভাল-মন্দ খাইয়া লইয়া শেষে যে আমার বউয়ের হাতে আড়াই টাকা দামের একখানা মাল ছোঁওয়াইয়া দিয়া কাইটা পড়বি, তা কিন্তু হইব না। কি, রাজী?

—রাজী। একদিকে প্রকাশক, অন্যদিকে ডবল বৌভাত। এ অবস্থায় রাজী না হয়ে উপায় কি!

—বেশ, তাইলে শুইনা রাখ ভাল কইরা। নামটা একটু চেঞ্জ কইরা দিস। হাজার হউক, নিজের কেচ্ছা। চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা আছে তো।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, কাহিনীকার হিসেবে আমার নাম থাকলেও আসলে এ গল্প আমার নয়, বলাইয়ের। এর ভাল-মন্দ সব

কিছুই বলাইয়ের প্রাপ্য। আমি শুধু তার কেচ্ছার কাহিনী একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে দিলাম মাত্র।

দুই বন্ধু। বলাই আর শঙ্কর।

অবশ্য আসল নাম শঙ্কর নয়, তবু বলাইয়ের অনুরোধে আমি তাকে শঙ্কর বলেই উল্লেখ করব এ কাহিনীতে।

বলাই উঠতি কমেডিয়ান। কলকাতার বহু জলসাতেই আপনারা তার হাস্যকৌতুক ও প্যারডি গান শুনেছেন। এ ব্যাপারে তার দক্ষতা সত্যই অসাধারণ!

ছবিতে অবশ্য এখনো পর্যন্ত তাকে বড় একটা দেখা যায়নি, তবে যাবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ হোক, কাল হোক, চান্স সে পাবেই। সেদিন কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

শঙ্কর বিখ্যাত প্লে-ব্যাক শিল্পী।

এ পর্যন্ত অসংখ্য ছবিতে সে গান গেয়েছে। বেশির ভাগ সুপারহিট। সেদিক থেকে তার জনপ্রিয়তা শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাংলার বাইরেও তার চাহিদা যথেষ্ট।

যাকে বলে মানিকজোড়। যেখানে শঙ্কর, সেখানে বলাই। বস্তুতঃ এ পর্যন্ত এমন একটি জলসাও বোধকরি দেখা যায়নি, যেখানে শঙ্কর আছে, অথচ বলাই নেই।

অধুনা শঙ্করের পার্শ্বচর, সেক্রেটারী, গার্জিয়ান সব কিছুই বলাই। বলাইয়ের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করার মত সাধ্য আজ সত্যই তার নেই।

ছেলে হিসেবে সত্যই তুলনা নেই বলাইয়ের। বন্ধু শঙ্কর তার চাইতে অনেক বেশি উপার্জন করে, তা নিয়ে একটুকুও দুঃখ নেই তার।

দুঃখ শুধু এক জায়গায়। শঙ্কর মেয়েমহলে অত্যন্ত প্রিয়।

সবাই তাকে ভালবাসে। পথে-ঘাটে দেখা পেলে সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাব সামনে। শঙ্কর ছাড়া আব কোন কথাই নেই তাদের মুখে।

ঠিক তার বিপবীত হল বলাইয়েব বেলায়। সবাই তাকে দেখে হাসে। সবাই ঠাট্টা কবে। মন্তব্যও করে কেউ কেউ। যেন সে একটা হাসির বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেন এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব।

বলাইয়ের কি কোন সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই ?

তার কি কাউকে একটু ভালবাসতে ইচ্ছা করে না ?

তার কি বয়েস হয়নি ?

লক্ষ্মীছাড়া মেয়েগুলো একথা বোঝে না কেন ?

সমস্যা আরো ঘোবাল কবে তুলেছে শর্মিলা।

বড়লোকের বাউণ্ডুলে মেয়ে। সাধ ছিল ছবিতে নেমে সুচিত্রা সেন হবেন, কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। সুচিত্রা সেন হওয়া দূরের কথা, চান্সই মেলেনি এ পর্যন্ত।

বাদ সেধেছে খ্যাঁদা নাকটা।

ফলে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে বাংলা ছবির পরিচালকদের ওপব। নেহাত শত্রুতা করেই নাকি ওবা তাকে চান্স দেয়নি, নইলে নাকটা তার এমন কিছু খ্যাঁদা নয়, স্লাইট এ টু চাপা মাত্র। তা ফিলিম লাইনের মেয়েদের মধ্যে এমনি চাপা নাকের এমন কিছু অভাব নেই।

কোনদিকে হালে পানি না পেয়ে অধুনা সে এসে ভর করেছে শঙ্করের ওপব।

শঙ্করকে নাকি সে ভালবাসে। শঙ্করকে না পেলে তার লাইফটাই নাকি ডেজার্ট হয়ে যাবে।

শঙ্করের অবস্থাও তাই। শর্মিলা ছাড়া এখন আর কোন কথাই নেই তার মুখে।

বলাই যাই বলুক না কেন, মেয়ে হিসেবে শর্মিলার নাকি তুলনা হয় না। তাছাড়া শর্মিলা না থাকলে এখন নাকি তার মুডই আসে না গান গাইতে। বিশেষ করে কলকাতার অগণিত জলসাগুলিতে।

অবশ্য একটু জেদী মেয়ে। তা জেদী হওয়াটা এমন কিছু অন্যায় নয়।

হাজার হোক বড় ঘরের আদুরে মেয়ে। বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। থাকার মধ্যে এক বৃদ্ধা পিসিমা, আব নাবালক ছোটভাই মণ্টু। এ অবস্থায় জেদী তো একটু হবেই।

ফলে বিপদ হয়েছে বলাইয়ের। যে কারণেই হোক, শর্মিলা তাকে একেবারেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তার মতে বলাই নাকি একটা ইডিয়েট ছাড়া আর কিছুই নয়।

শঙ্কর প্রতিবাদ করে। বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু শর্মিলা তা মানতে রাজী নয়। তাব এক কথা, বলাই একটা ইডিয়েট। ইডিয়েট ছাড়া আর কিছুই ওকে বলা যায় না।

বলাইও একথা জানে। জানে বলেই মনে মনে বেশ একটু সে সমীহ করে চলে শর্মিলাকে। ভেতরে ভেতরে ভয়ও করে কিছুটা।

কিন্তু মুখে তা মানতে নারাজ। বরং শর্মিলার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝেই সে তেজ দেখিয়ে শঙ্করকে বলে, তোর ঐ খেঁদীবে শনিতে গুতায়, এই একখানা কথা কইয়া দিলাম। বেশি তেরি-বেরি করলে একদিন বৌঠাইনরে ডাইকা আইনা ওর খ্যাঁদা নাকটারে আরো খ্যাঁদা কইরা দিমু না!

হা হা কবে হেসে ওঠে শঙ্কর। মুখে যাই বলুক না কেন, বন্ধু-বৎসল বলাইকে তার চাইতে বেশি আর কে জানে!

অজয় বিশ্বাসের পরিচালনায় সাদার্ন সমিতির জলসা। প্যাণ্ডেলে তিলধারণেরও স্থান নেই। বাইরেও সেই একই অবস্থা। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ।

ডায়াসে বসে একটার পর একটা গান করে চলেছে শঙ্কর। শ্রোতারা এত সহজে তাকে ছাড়তে রাজী নয়।

আড়ালে শিল্পীদের মধ্যে বসে শর্মিলা। অধুনা শঙ্করের সঙ্গে প্রতিটি জলসায় তার হাজির থাকা চাই-ই। যত রাতই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তার এতটুকুও ক্লান্তি নেই।

শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ওদিকে শঙ্কর তখন শুরু করেছে তার সম্প্রতি গাওয়া সুপারহিট গান।

'তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন রাশি রাশি
আমি যে তোমার গানের ছন্দ, তুমি যে আমার বাঁশি,
ওগো প্রিয়া মোর, তুমি যে আমারে করেছ তোমার কবি,
তোমার চোখেতে দেখেছি আমি যে অন্তরবির ছবি॥'

পরবর্তী অনুষ্ঠান বলাইয়ের প্যারডি গান ও হাস্যকৌতুক। গান শুরু করার আগে প্রথমেই সে শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলল:

'বন্ধুগণ, বিখ্যাত গায়ক শঙ্কর চৌধুরীর মুখ থিকা তার হিট গান আপনেরা শুনলেন। এইবার আমার মুখ থিকা শোনেন। তবে আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। মাঝে মাঝে কথা উল্টা-পাল্টা কইরা ফালাই। দয়া কইরা সেইটুকু আপনেরা মার্জনা কইরা নিয়েন। যাউক, শুরু করি···

তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন রাশি রাশি
আমি যে তোমার গানের ছন্দ, তুমি যে খোদার খাসি,
ওগো, তুমি যে খেঁদীর পিসি।
ওগো খেঁদী মোর, তুমি যে আমারে করেছ তোমার কবি,
তোমার চোখেতে দেখেছি আমি যে শনি ঠাকুরের ছবি।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল অগণিত শ্রোতার দল। এমনকি ভেতরের শিল্পীরাও বাদ গেল না।

আর শঙ্করের তো কথাই নেই। হাসতে হাসতে একসময়ে সে বসে পড়ল মাটিতে।

ব্যতিক্রম শুধু শর্মিলা। সঙ্গে সঙ্গেই সে সরোষে মন্তব্য করল, ইডিয়েট!

—কি হল? অবাক হয়ে তাকাল শঙ্কর। হঠাৎ শর্মিলা রেগে গেল কেন এমন করে?

—কেন ও এভাবে তোমার গানকে বিকৃত করে গাইবে। ফুঁসে উঠল শর্মিলা, এতে অপমান হয় না তোমার?

—অপমান! হেসে জবাব দিল শঙ্কর, না, অপমান হয় না, হয় পাবলিসিটি।

—তার মানে? সরোষে তাকাল শর্মিলা।

—মানে খুবই সোজা। জলসাতে এলেই আজকাল হেমন্ত-কণ্ঠ, লতা-কণ্ঠ, এমনি কত কি বিশেষণ শোনা যায়। এর ফলে পরোক্ষ-ভাবে পাবলিসিটি হয় কার? হেমন্ত বা লতারই নয় কি? নইলে ক'জন হেমন্ত বা লতা-কণ্ঠ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? একজনও পেরেছে কি? না, পারেনি। পারা সম্ভবও নয়। আসল আর নকলের তফাত ঐখানেই।

—তা বলে বেছে বেছে কেবলমাত্র তোমার গানগুলোই ও এভাবে প্যারডি করবে কেন?

—আমাকে ভালবাসে বলেই। নইলে হিট গান তো অন্যান্য শিল্পীদেরও ছিল।

—তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। যাক, চল এবার ফিরে যাই। তোমার প্রোগ্রাম তো শেষ হয়েছে। আর দেরি করে লাভ কি।

—দেরি বলাইয়ের জন্য। ওর হোক, তারপর একসঙ্গেই যাওয়া

যাবে। ঠিক আছে, তুমি গাড়িতে গিয়ে বস। আমি দেখে আসছি ওর হল কিনা।

যথাসময়ে প্রোগ্রাম শেষ করে বলাই ডায়াস থেকে নেমে আসতেই খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল শঙ্কর, আর একমিনিটও দেরি নয়। চল এবার গাড়িতে।

—গাড়িতে! সভয়ে পিছিয়ে গেল বলাই, উঁহুঁ, আমি পরে যামু।

—কারণ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল শঙ্কর।

—কারণ তোর ঐ খেঁদী। যেই গান আইজ গাইছি, তারপর আস্ত খাইয়া ফালাইব না আমারে!

—খুব হয়েছে। চল এবার। একরকম টানতে টানতেই বলাইকে নিয়ে শঙ্কর এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। রাত অনেক হয়েছে। আর দেরি নয়।

পরদিন ভোরেই বলাই শঙ্করের কাছে গিয়ে হাজির। এটা তার বহুদিনকার অভ্যাস। বলতে গেলে দিনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে তার শঙ্করের এখানে।

কথায় কথায় কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। তারপরই একসময়ে কলিং বেলটা বেজে উঠল ঝন ঝন করে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরজার দিকে এগিয়ে গেল বলাই। কে আবার জ্বালাতে এল এই সাতসকালে।

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নাম অরবিন্দ মজুমদার। শিল্পী শঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা করা প্রয়োজন।

একে একে সব কথাই খুলে বললেন অরবিন্দ মজুমদার। শীগগীরই বাংলার বাইরে অবস্থিত একটা গার্লস কলেজের রি-

ইউনিয়ন উৎসব। শঙ্করকে তাঁদের চাই। তার জন্য যথাসাধ্য পারিশ্রমিক দিতে তাঁরা প্রস্তুত।

—আপনি কি ওখান থেকেই আসছেন নাকি? প্রশ্ন করল শঙ্কর।

—আজ্ঞে না, আমি এখানেই থাকি, তবে ঘর-বাড়ি যা কিছু সবই আমার ওখানে। ওরা আপনার ঠিকানা জানে না, তাই আমাকে লিখেছে আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।

—ফাংশন কবে?

—আসছে শনিবার। তবে যেতে হবে আপনাকে শুক্রবারেই। এখান থেকে বিকেল চারটেয় যে প্লেন ছাড়ে, তা ওখানে ল্যাণ্ড করতে করতে রাত সেই আটটা। তারপর আবার প্রায় ঘণ্টাখানেক মোটর-জার্নি। সুতরাং আগের দিন স্টার্ট করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ ফাংশন ঠিক সাতটায়।

—আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন তো?

—আজ্ঞে না, আমার যাবার কোন উপায় নেই। তবে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। ওখানে এরোড্রোমে লোক থাকবে। তাছাড়া আমি আগে থেকেই টেলিগ্রাম করে সব জানিয়ে দেব কলেজ সেক্রেটারী মনোরমা দেবীকে। ওঁর বাড়িতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

ঠিক হল, শুধু শঙ্কর নয়, বলাইও যাবে। অবশ্য তার জন্য অতিরিক্ত আরো পাঁচশত টাকা গুণে দিতে হল অরবিন্দ মজুমদারকে, কিন্তু উপায় কি! বন্ধু বলাইকে বাদ দিয়ে শঙ্কর যে কোথাও যেতে রাজী নয়।

—আমি তাহলে টেলিগ্রাম করে ওদের জানিয়ে দিতে পারি? দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অরবিন্দ মজুমদার।

—বেশ, তাই দিন। সম্মতি জানাল শঙ্কর।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—খ্যাপ্‌টা ভালই পাওয়া গেল। অরবিন্দবাবু চলে যেতেই এবার মুখ খুলল বলাই, এই ফাঁকে ফোকটে বাইরের থিকা ঘুইরা আসন যাইব, কি কস?

—তা মন্দ কি!

—কিন্তু খেঁদীর কি হইব? তারেও লগে কইরা লইয়া যাবি নাকি?

—কি যে বলিস! হাসতে হাসতে বলল শঙ্কর, ওখানে ওর যাওয়া কি করে সম্ভব!

—না গেলে কেমনে চলব? চক্ষের সামনে আয়নার মত বইয়া না থাকলে তোর মুড আইব কি কইরা?

—তোর হিংসে হয় বুঝি?

—হয়। মিথ্যা কথা কমু না, এক এক সময় খুবই হিংসা হয়। কি কপাল লইয়াই না জন্মাইছিলি তুই। যে মাইয়া দেখে, সেই লেটুকী খাইয়া পড়ে। আর আমার! মাইয়া তো দূরের কথা, একটা ঝি-চাকরাণী পর্যন্ত কপালে জুটল না।

—চেষ্টা করলেই তো পারিস। শঙ্করের সারামুখে কৌতুক।

—চেষ্টা কি আর কম করেছি রে ভাই। স· া বিরাট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল বলাই, অনেক চেষ্টা করছি। খরচ-পত্তরও কম করি নাই। কিন্তু করলে কি হইব। একটাও ধোপে টিকল না।

—কারণ? হাসি চেপে বলল শঙ্কর, নিশ্চয় তুই বুঝিয়ে বলতে পারিসনি।

—ক্যামনে বুঝামু? দেখলেই খালি দাঁত কেলাইয়া হাসে। যেন আমি একটা চিড়াখানার হনুমান অ. ্ কি!

উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে ভেঙে পড়ল শঙ্কর। সে কি হাসি। মুহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার।

সহসা কার দূরাগত পায়ের শব্দ শুনে ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল বলাই। সারামুখ তার বিবর্ণ। রক্তশূন্য।

শঙ্কর অবাক। কেন সহসা বলাইয়ের এই অদ্ভুত ভাবান্তর? কি ব্যাপার?

—খেঁদী। কোনরকমে কথাটা উচ্চারণ করেই সঙ্গে সঙ্গে বলাই ছুটে গেল অন্দরের দিকে। আর ফিরেও তাকাল না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে এসে পা দিল শর্মিলা। সারামুখে তার খুশির জোয়ার। কি ব্যাপার! এত হাসছিলে যে!

—না, এমনিই। নিমেষে সপ্রতিভ হয়ে ওঠে শঙ্কর।

—একা একাই হাসছিলে নাকি এতক্ষণ?

—না, ঠিক একা নয়। শঙ্কর বিব্রত, মানে···মানে···আমরা···

—বুঝেছি। নিমেষে সারামুখে শ্রাবণের গাম্ভীর্য নামে শর্মিলার, তাই তো ভাবছিলাম যে সহসা এই লাগাম-ছাড়া হাসি কেন? সে যাকগে, খবরাখবর কি বল?

—বাইরে যাচ্ছি। ছোট্ট করে জবাব দিল শঙ্কর।

—বাইরে! কোথায়?

একে একে সব কথাই খুলে বলল শঙ্কর। কিছুই গোপন করল না।

—ফিরতে ক'দিন লাগবে?

—বড়জোর দিন তিনেক।

—আমি কিন্তু বড্ড চিন্তায় থাকব। আদুরে গলায় বলল শর্মিলা, ওখানে গিয়েই আমাকে টেলিগ্রাম করবে, বুঝলে?

—মাত্র তো তিন দিনের ব্যাপার। হেসে জবাব দিল শঙ্কর, তাইতেই এত ভাবনা! ঠিক আছে, করব তোমাকে টেলিগ্রাম।

—কবে যেতে হবে?

—শুক্রবার। বিকেল চারটেয় প্লেন।

—শুক্রবার। সেকি! ওদিন যে তোমার মিউজিক টেক্ রয়েছে।

—বল্ল কি! তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা দেখে নিয়ে হতাশভাবে বলল শঙ্কর, তাই তো দেখছি। ইস, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। অথচ এদিকে কনট্রাক্ট সই করে টাকা পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছি। এখন উপায়?

—হেমন্তবাবুকে বলে মিউজিকের ডেট্‌টা একটু পিছিয়ে নিলে হয় না?

—দেখি একবার রিং করে।

ত্রস্তে পাশের ঘরে চলে গেল শঙ্কব। আবাব ফিবে এল মিনিট কয়েক বাদেই।

—কি হল? কণ্ঠে ব্যগ্রতা ঝবে পড়ে শর্মিলাব।

—সুবিধে হল না। পবদিনই হেমন্তবাবু বম্বে চলে যাবেন। তাছাড়া স্টুডিও, অর্কেস্ট্রা পার্টি সব বুক কবা হয়ে গেছে। সুতবাং শুক্রবার ছাড়া কোন উপায় নেই।

—অসম্ভব! এ হতেই পারে না।

—কেন পাববে না। হেমন্তবাবু বলেছেন, দুটোব মধ্যেই আমাকে ছেড়ে দেবেন। তাহলে অসুবিধের কি আছে।

—বাঃ বে! তা কি করে হবে? মাত্র তো দুঘণ্টা সময়। তাব মধ্যে বাসায় ফিবে এসে সুটকেস বেডিং সব গুছিয়ে নিয়ে ..

—ওসব বলাই নিয়ে যাবে। ও-ই তো যাচ্ছে আমার সঙ্গে। আমি ওখান থেকে ডিরেক্ট দমদম চলে যাব।

—ধন্যবাদ। সহসা গম্ভীব হয়ে গেল শর্মিলা, আমার জানা ছিল না। তা তিনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন, তখন আর ভাবনা কি। জার্নিটা ভালই কাটবে আশা কবি।

—তোমাকে একটা প্রশ্ন করব শর্মিলা? একটু ইতস্তত করে বলল শঙ্কর, বলাইয়ের ওপর তোমার এই অহেতুক রাগ কেন? কেন তুমি ওকে সহ্য করতে পার না?

—ইডিয়েট বলে। ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিল শর্মিলা, কি করে

যে তুমি ওকে স্ট্যাণ্ড কর, তা তুমিই জান। আমি তো একথা চিন্তাও করতে পারিনে।

—কারণ? পাল্টা প্রশ্ন করল শঙ্কর।

—নম্বর ওয়ান ইডিয়েট বলেই। হাজার হোক, তুমি বাংলাদেশের একজন পপুলার আর্টিস্ট। সেদিক থেকে তোমার একটা আলাদা প্রেস্টিজ আছে। তা সত্ত্বেও ওর মত একটা ইডিয়েটের সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করাটা তোমার অন্তত শোভা পায় না। কথাটা স্বীকার করবে আশা করি?

—ঠিক বলেছ তুমি। বড় দুঃখের এক মর্মরাঙা হাসি দেখা দিল শঙ্করের চোখে-মুখে, সত্যিই ও একটা ইডিয়েট। আর আমি বাংলা-দেশের সবচাইতে পপুলার আর্টিস্ট শঙ্কর চৌধুরী। কিন্তু পাঁচ বছর আগে! সেদিন কে চিনত এই শঙ্কর চৌধুরীকে? চিনত শুধু এই ইডিয়েটটা। কি না সেদিন ও করেছে আমার জন্য। অলিতে গলিতে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, প্রতিটি জলসায় আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরেছে—'আমার এই বন্ধুটিকে আপনারা একটু গাইবার সুযোগ দিন।' কেউ কেউ হয়তো দিয়েছে, তবে অনেকেই দেয়নি। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আজ আমি বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী, তা বলে সেদিনের সেই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আমি ভুলব কি করে বল?

—সরি! কেমন যেন নরম শোনাল শর্মিলার গলাটা, এসব কথা আমার জানা ছিল না। এ্যাদ্দিন আমাকে জানাওনি কেন বল তো?

—জানাতে দিলে কোথায়? আত্মগতভাবেই বলতে লাগল শঙ্কর, আজ কথা উঠল বলেই বললাম। বলাই ইডিয়েট, একথা হয়তো বা সত্য, কিন্তু সেটাই ওর সবচাইতে বড় পরিচয় নয়। আজ আমার অনেক ভক্ত, অনেক বন্ধু, অনেক গুণগ্রাহী। কিন্তু ভগবান না করুন,

কোন্‌দিন যদি এই কণ্ঠসম্পদ হারিয়ে ফেলি, সেদিন কিন্তু কেউ থাকবে না। থাকবে কেবলমাত্র ঐ ইডিয়েটটাই।

—আমি বুঝতে পারিনি শঙ্কর। কতকটা অপরাধীর মতই বলল শর্মিলা, কথা দিচ্ছি, আর কোনদিনও বলাইবাবুকে আমি ইডিয়েট বলব না। এক্ষুনি আমি ওঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কোথায় গেলেন উনি?

—ভেতরেই আছে হয়তো কোথাও।

—আমি ডেকে আনছি।

কথাটা বলেই ভেতবের দিকে পা বাড়াল শর্মিলা।

সত্যিই তার ভুল হয়ে গেছে। সেই ভুলের জন্য বলাইবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে আজ আর তার এতটুকুও আপত্তি নেই।

কিন্তু কোথায় বলাইবাবু? কোথাও নেই তো। গেলেন কোথায়?

অত কাঁচাছেলে বলাই নয়। শর্মিলার সাড়া পেয়ে সেই যে সে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে তারপর আর একবারও সেখান থেকে বেরিয়ে আসেনি। যা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওকে বিশ্বাস কি! আগে ও চলে যাক, তারপর অন্য কথা।

ঠক-ঠক-ঠক-ঠক।

ভৃত্য সনাতনের মুখ থেকে খবর পেয়ে এবার বাথরুমের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করল শর্মিলা।

সারা মুখে তার দুষ্টুমির হাসি। বেশ মজার লোক বলাইবাবু। আগে থেকে সাড়া না দিয়ে এবার তার সঙ্গে একটু মজা করা যাক।

বলাই নিশ্চিন্ত। কে কড়া নাড়ে এভাবে? নিশ্চয়ই শঙ্কর। শঙ্কর ছাড়া কেউ হতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই সে সাড়া দিল ভেতর থেকে।

—উহু, খুলুম না। ঐ নাকবোঁচা খেঁদীটা যতক্ষণ ঘরে আছে, ততক্ষণ কিছুতেই খুলুম না।

—ইডিয়েট! কথাটা বলেই গট্‌গট্‌ করে শঙ্করের ঘরে গিয়ে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল শর্মিলা, এতবড় সাহস! শেষে কিনা আমাকে অপমান!

—অপমান! শর্মিলার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল শঙ্কর, কি বলছ তুমি!

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে। ঝাঁঝিয়ে উঠল শর্মিলা, আর এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকতে চাইনে!

—কি আশ্চর্য! বাধা দিল শঙ্কর, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে তো আমাকে। কে তোমাকে অপমান করেছে?

—তোমার প্রাণের বন্ধু বলাই।

—বলাই! শঙ্কর অবাক, জেনে-শুনে বলাই তোমাকে অপমান করবে, কক্ষনো তা হতে পারে না। নিশ্চয় তুমি ভুল করেছ।

—কক্ষনো ভুল করিনি। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে শর্মিলা, স্পষ্ট করেই সে আমাকে বলেছে···

—কি বলেছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল শঙ্কর।

—খেঁদী। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল শর্মিলার।

—খেঁদী! হা-হা করে হেসে উঠল শঙ্কর, তাই বল। বলাই তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

—কেন ঠাট্টা করবে? কেন সে সব সময়ে আমাকে খেঁদী বলবে? কেন সে প্যারডি গাইতে গিয়ে আমাকে মীন করে অমন করে খেঁদী খেঁদী বলবে? আমি কি বুঝিনে কিছুই? তাই তো ওর ওপর আমার অত রাগ।

—তাই বুঝি! হাসতে হাসতে বলল শঙ্কর, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি তোমার সামনে বলাইকে ডেকে এনে মানা করে দিচ্ছি, আর কোনদিনও সে তোমাকে খেঁদী বলবে না। সত্যিই তো। কেন সে শুধু শুধু তোমাকে খেঁদী বলবে। খেঁদী তুমি কোনকালেই নও।

আসলে নাকটা স্লাইট একটু চাপা মাত্র। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি সে-কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি বলাইকে।

কোথায় বলাই? ভুল বুঝতে পেরে ততক্ষণে সে পেছনের দরজা দিয়ে হাওয়া।

কথা ছিল বেলা বারোটায় মিউজিক টেক্ শুরু হবে, কিন্তু হতে হতে সেই দুটো। সিনেমা লাইনের ব্যাপার। সুতরাং বলার কিছু নেই।

দেখে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে শঙ্কর। আর মাত্র দু-ঘণ্টা বাকি, অথচ এখনো পর্যন্ত শুরুই হল না। এভাবে দেরি হলে চারটের মধ্যে সে দমদম গিয়ে পৌঁছবে কি করে।

—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? অভয় দিয়ে বললেন হেমন্তবাবু, এক্ষুনি হয়ে যাবে। তোমাকেই প্রথমে ছেড়ে দেব। নাও ওঠো। টেক্ প্লীজ।

প্রথম টেক্ শেষ হল বেলা ঠিক তিনটেয়। দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শঙ্কর। যাক, এখনো একঘণ্টা বাকি আছে। সঙ্গে যখন গাড়ি রয়েছে, তখন ভাবনা কি। একঘণ্টায় দিব্যি হেসে-খেলে দমদম পৌঁছনো যাবে। মালপত্তর নিয়ে বলাই তো আগেই চলে গেছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

বাদ সাধলেন সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট সত্যেন চাটুয্যে। উঁহু, আর একটা টেক্ কর ভাই হেমন্ত।

—কিন্তু আমার আর এক মুহূর্তও দেরি করার উপায় নেই। কাতরভাবে বলল শঙ্কর, চারটেয় প্লেন।

—ভাবছ কেন এত। দমদম যেতে কতক্ষণ আর লাগে। এক্ষুনি হয়ে যাবে। নাও, টেক্।

শুরু হল নানারকম জরুরী নির্দেশ।—টোপাদাকে একটু মাইকের সামনে এগিয়ে আসতে বল হেমন্ত ভাই। উঁহু, শৈলেশকে আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে বাঁশিটা নিয়ে। রাধাকান্ত, বাঁয়াটা একটু চেপে। উঁহু, মাইকটা ঠিকমত সেটিং হয়নি। দাঁড়াও, আমি আসছি।

অবশেষে ছুটি পাওয়া গেল ঠিক তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিটে।

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কব রওনা দিল গাড়ি নিয়ে। তার দেরি দেখে ওদিকে বলাই কি ভাবতে শুরু করেছে কে জানে।

—একটু দেখে চালাও শঙ্কর। মাঝে মাঝে সাবধান করে দেয় শর্মিলা।

—কোন উপায় নেই। আর মাত্র তেরো মিনিট বাকি। দেবি হলে প্লেন ধরতে পারব না।

ওদিকে বলাই তখন রীতিমত চিন্তিত। মাইকে নাম ঘোষণা করা হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় শঙ্কব! যাক, এখনো মিনিট চাবেক বাকি আছে। এরই মধ্যে এসে পড়বে নিশ্চয়ই। ততক্ষণে লটবহর নিয়ে ওঠা যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এরোড্রোমে পৌঁছে গেল শঙ্কর, কিন্তু কোথায় তখন প্লেন! রানওয়ের ওপব বার তুয়েক চক্কব দিয়ে প্লেনটা তখন দিকচক্রবালে মিশে যেতে শুরু করেছে বলাইকে নিয়ে।

নিশ্চল পাথরেব মত কয়েক মুহূর্ত দূবে অদৃশ্যমান প্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্কব। তুচোখে তার রাশি রাশি শূন্যতা।

একদিকে রি-ইউনিয়ন উৎসবে উপস্থিত থাকবে বলে সে চুক্তিবদ্ধ, অন্যদিকে ওখানে যাবারও কোন রাস্তা খোলা নেই।

কি কবা যায় এখন এ পরিস্থিতিতে? কিছু একটা ব্যবস্থা না করলেই যে নয়।

ওদিকে বলাইয়ের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। তার নিজের ভাষায়ঃ

'কি-কমুরে ভাই বহুরূপী, কাণ্ড দেইখা আমি তাজ্জব। তারপর কাইন্দাই ফালাইলাম ভর্‌ভর্‌ কইরা। কি করুম অখন আমি। কই যামু। কোন্‌ মুখে ঐখানে গিয়া কমু যে, শঙ্কর আসে নাই। কইলে পিঠের চামড়া খুইলা ফালাইব না।

ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম যে, আমি একজন থার্ড পার্সন হইয়া যামু। অর্থাৎ, শঙ্কর বা বলাই কাউরে আমি চিনি না। আমি অন্য লোক। তারপর একটু ফাঁক পাইলেই সোজা কাট্‌।

পাহাড় ঘেরা ছবির মত ছোট্ট মত শহর। লোকসংখ্যার বেশির ভাগই বাঙালী।

শহরের প্রতিটি মানুষই সেদিন উৎসাহে ভরপুর। কাল রি-ইউনিয়ন উৎসব।

উৎসবের প্রধান আকর্ষণ খ্যাতনামা শিল্পী শঙ্কর চৌধুরীর কণ্ঠ-সঙ্গীত। এই তিনি প্রথম পদার্পণ করছেন এ শহরে। সুতরাং এ সুযোগ কোনরকমেই ছাড়লে চলবে না।

গার্লস কলেজের কমন-রুমেও সেই একই চঞ্চলতা। হাসি-ঠাট্টাও কিছু কিছু চলছে এই নিয়ে। সবারই একমাত্র লক্ষ্য, মিনতি।

সেক্রেটারী মনোরমা দেবীর একমাত্র মেয়ে মিনতি। মিনতি নাকি শঙ্করের গানের দারুণ ভক্ত। একমাত্র শঙ্কর ছাড়া আর কারো গানই নাকি তাঁর ভাল লাগে না।

—শঙ্করবাবু এখানে এসে তোদের কোয়ার্টারেই থাকবে, তাই না রে? প্রশ্ন করে তপতী।

—হ্যাঁ, তাই। ছোট্ট করে জবাব দিল মিনতি।

—দেখিস, কাছে পেয়ে আবার বরফের মত গলে যাসনে যেন।

—তোর হিংসে হয় বুঝি? ফুট কাটে নমিতা।

—তা একটু হয় বৈকি।

—হলে কি হবে, মিনতি থাকতে তোর কোন চান্স নেই। তুই তো আর ওর মত অতবড় ভক্ত নোস। কি, ঠিক বলিনি রে মিনতি?

—ভক্ত কিনা জানিনে, তবে একথা ঠিক যে, ওর গান আমি ভালবাসি।

—আর মানুষটাকে?

—কি জানি। ভেবে দেখিনি।

—এবার দেখবি, তাই না রে?

—দেখবে বৈকি! মিনতির আগেই বলে ওঠে শম্পা, পেলে কি আর কেউ ছাড়ে। তুই নিজেই কি ছাড়তিস। বল না নিজের বুকে হাত রেখে।

—ওসব থাক। সবার উদ্দেশ্যে বলল মিনতি, এবার কাজের কথা শোন। মা বললেন, ওকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলেজের পক্ষ থেকে আমাদের কয়েকজনের এরোড্রোমে যাওয়া উচিত। কলেজেব বাস রয়েছে, সুতরাং অসুবিধের কিছু নেই। এবার কে কে যেতে চাস বল?

সবাই রাজী। মুখে মিনতিকে নিয়ে যতই হাসি-ঠাট্টা করুক না কেন, কাজের বেলায় দেখা গেল কেউ এ-সুযোগ হারাতে রাজী নয়। শঙ্কর চৌধুরী দামী ছেলে। কপালে থাকলে লেগে যেতে কতক্ষণ।

সূর্য ঢলে পড়েছে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে।

আলো-আঁধারীর খেলা শুরু হয়েছে পাহাড়ের মাথায় মাথায়, আর চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে। একটু পরেই দিশাহীন প্রান্তরের বুকে নেমে আসবে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া।

—মিনতি! ভড়কে গিয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগল বলাই, মিনতির থিকা মানু। বাঃ! মিঠা নাম।

চমক ভাঙল মিষ্টি মেয়েলী হাসিব শব্দে। দেখা গেল বান্ধবীদেব মধ্যে সবাই তখন উপস্থিত। হুড়মুড় কবে সবাইকে নিযে ঘবে ঢুকে রেখাই প্রথম মুখর হয়ে উঠল দলেব মুখপাত্ররূপে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন শঙ্ববাবু। মিনতি আমাদেব ভাবি মিষ্টি মেয়ে। তাছাড়া আপনাব দারুণ ভক্ত।

—শুধু ভক্ত! এবাব মুখ খুলল বন্না, ও তো আপনি ছাডা আব কাউকে আর্টিস্ট বলেই স্বীকাব কবে না। তাই না বে মিনতি?

—একটা কথা বলব তোদেব? নিজেকে যথাসম্ভব সংযত কবে বলল মিনতি:

সবাই ফিবে তাকাল মিনতিব দিকে। কি ব্যাপাব? কি বলতে চায় মিনতি!

—উনি খুব টায়াড। অনেকটা পথ জার্নি কবে এসেছেন। ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিবি তোবা?

—সবি! আদব কবে মিনতিব গাল টিপে দিযে জবাব দিল দুষ্টু মেয়ে বেখা, কথাটা আমাদেব একদম মনে হয়নি। ঠিক আছে, তোবা গল্প কব, আব তোদেব ডিসটাব কবব না। চলি। মিষ্টি মেয়ে। টা—টা—

সঙ্গে সঙ্গেই বেখা যেমন এসেছিল, তেমনি কবেই আবাব ফিবে গেল সবাইকে নিয়ে। আব ফিবেও তাকাল না।

—ওদেব কথায় আপনি কিছু মনে কববেন না যেন। এক বিষাদ-কাতরতা ছলছালয়ে ওঠে মিনতিব চোখে-মুখে, ওরা আমাব বান্ধবী...

চোখ ফেরাতে গিয়েও ফেবাতে পাবে না বলাই। মেয়েটির দুচোখে কি মধুরতম আবেদন। দেখলেও যেন মায়া হয়।

বলাইয়ের ভাষায়ঃ 'ভাই রে, এই আমি প্রথম ভাল কইরা চাইয়া দেখলাম মাইয়াটার দিকে। আহা, কি সোন্দর! মাইয়া তো না, ঠিক যেন একটা গোলাপফুল ফুইট্টা রইছে।

আমার অবস্থা তখন ভাইবা দেখ বহুরূপী। এতকাল কেউ আমারে একটা মিঠা কথা কয় নাই। যে দেখছে, সেই দাঁত কেলাইয়া হাসছে। আর এই মাইয়াটা কিসে আমি একটু ভাল থাকুম, তার জন্য সেই কখন থিকা খাইটা মরতে আছে।

কি কমু রে ভাই, সারা রাইত ঘুম হইল না। হিসাবে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। আগে ঠিক করছিলাম, ফাঁক পাইলেই পলাইয়া যামু। অখন ঠিক করলাম যে, না, পলামু না। ধরা পইড়া কিল-গুঁতা খাইতে হয় তো খামু, তবু এমন মাইয়া ছাইড়া কিছুতেই পলাইতে পারুম না।

পুব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

ঘরে ঢুকে মিনতি ডাকে, শঙ্করবাবু! চা-টা খেয়ে নিন।

—অ্যাঁ! ধড়মড় করে উঠে বসে বলাই। সারা মুখে তখনো তার রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তির কালিমা।

—চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অসীম মমতা ঝরে পড়ে মিনতির কণ্ঠে, খেয়ে নিন।

—হ, খাইতে আছি। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নেয় বলাই। একটু বাদেই ঘরে ঢোকেন মনোরমা দেবী। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো বাবা!

—অসুবিধা! জবাব দিল বলাই, কি যে কন মাসীমা! এত আদর, এত সেবা-যত্ন বাপের জন্মেও আমি কোনদিন পাই নাই।

—আমারে? বলাই অবাক, আমারে এইখানে কে ডাকব! ঠিক আছে, তুমি বস, আমি দেইখা আসি।

বাইরে গিয়েই বলাই অবাক।

কে! কে এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে!

একি দিবাস্বপ্ন, না মায়াবিভ্রম! না, কোনটাই নয়।

সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং শঙ্কর।

—উঃ! প্রাণ বেরিয়ে গেছে এখানে আসতে। বলাইকে দেখেই মুখর হয়ে উঠল শঙ্কর, খুঁজে খুঁজে অন্য লাইনের একটা প্লেনে উঠে ল্যাণ্ড করেছি দিল্লী। সেখান থেকে মোটরে একটানা আড়াইশো মাইল জার্নি শেষ করে তবে এসেছি।

—বেশ করেছেন। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল বলাই, আমার চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করেছেন। অ্যাদ্দিন বাদে ছল্লিবল্লি কইরা যাও বা একটা ম্যানেজ কইরা আনছিলাম, তাও দিলি মাঝখানে ভাংচি দিয়া।

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শঙ্কর। কি বলছে বলাই?—এসব কথার মানে কি?

—মানে আমার মাথা আর মুণ্ডু। নিজে যাই কর না ক্যান, বলাই নন্দীর সুখ তোমার সহ্য হইব ক্যান্। তিনি তো সব বেটাবেই।

—কি বলছিস তুই বলাই? শঙ্কর হতভম্ব।

—চো-প! চো-প! ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিল বলাই, এক্কেবারে চোপ। বলাই এইখানে আসে নাই। সে অখন কইলকাতায়। আইছে শঙ্কর।

—সেকি! শঙ্করের দুচোখে অর্থহীন দৃষ্টি, কি বলতে চাস তুই? কিছুই যে বুঝতে পারছিনে আমি।

একে একে সব কথাই খুলে বলল বলাই। মিনতি শঙ্করের ভক্ত। সুতরাং তার পক্ষে শঙ্কর হওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় ছিল না।

—বুঝেছি। ভয়ে ভয়ে বলল শঙ্কর, তাহলে এক কাজ করা যাক। আমি বরং চুপচাপ কেটে পড়ি। একসঙ্গে দুজনের আর তো শঙ্কর হওয়া চলবে না।

—পাগল নাকি! হঠাৎ খপ করে শঙ্করের কলার চেপে ধরল বলাই, তুই গেলে ঠেকা কাম চালাইব কে? ধরতে পারলে পোটকা ফাটাইয়া দিব না!

—কি মুশকিল! বিপন্নের মত বলল শঙ্কর, দুজনের এখানে থাকা কি করে সম্ভব! তুই তো শঙ্কর। আমি তাহলে কে?

—তুই হলি গিয়া—ইসে—মানে—এই যে! মিনতিকে আসতে দেখেই সহসা ফস করে বলে ফেলল বলাই, এইখানে আস, আলাপ করাইয়া দেই। এই হল মানু—মানে মিনতি, আর ঐ হইল আমার কইলকাতার বন্ধু—ইসে কি কয়—বলাই নন্দী।

—আপনার সঙ্গে যার আসার কথা ছিল···

—হ-হ, সেই বলাই নন্দী। কমেডিয়ান। যাও, এককাপ চা কর তাড়াতাড়ি। খাইটা-খুইটা অনেক দূর থিকা আইছে।

—তোর মতলবটা কি বল তো? মিনতি চলে যেতেই প্রশ্ন করল শঙ্কর।

—কেন, অতি সোজা মতলব। প্যারডি গান যখন গাইতে পারি, তখন তোর গানের লগে ঠোঁট মিলাইতে না পারনের কোন কারণ নাই।

—ওরে বাপ্‌স! ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে শঙ্কর, ও-সবের মধ্যে আমি নেই। ধরা পড়লে কেলেঙ্কারীর একশেষ।

—ধরা পড়তে যামু ক্যান্‌। বলাই নন্দী যে কি মাল, তা আর কেউ না জানলেও তোর তো আর জানতে বাকি নাই। তাইলে অত ঘাবড়ানের কি আছে। তুই তোর কাম ঠিকমত চালাইয়া যাইস, তারপর বেবাক ভার আমার। হঠাৎ খপ করে শঙ্করের হাতটা চেপে ধরল বলাই, ভাই রে, আমার অবস্থাটা একবার ভাইবা

দেখ। হাজার হাজার মাইয়া তোর জন্য পাগল, কিন্তু আমারে কেউ চায় না। দেখলেই খালি দাঁত কেলাইয়া হাসে। অ্যাদ্দিন বাদে কোনরকমে একটা পটাইয়া পুটাইয়া কায়দা কইরা আনছি—দেখিস, এইটা যেন আবার কাইটা না যায়। তাইলে কিন্তু আমি ঠাইট্ মইরা যামু।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল শঙ্কর। বলাই তার জন্য যথেষ্ট করেছে। একজনের উপকারটুকু শুধু অঞ্জলিভরে নেবে, প্রতিদানে কিছুই কি সে দেবে না?

রি-ইউনিয়ন উৎসব। অভিনন্দন, ভাষণ ও মাল্যদানের পালা শেষ। এবার সঙ্গীতানুষ্ঠান।

শুধু দুটি মাইক আর দুজন শিল্পী। বাদবাকি সবাইকে ডায়াস ছেড়ে নিচে নেমে যেতে হল শিল্পীর অনুরোধে।

ডায়াসে কেউ থাকলে নাকি তার মুড আসে না। গানের ব্যাপারে মুডই হল আসল কথা। মুড না এলে গান হবে কি করে।

বিরাট হল-ঘরের কোথাও আর তিলধারণের জায়গা নেই। কি ছোট, কি বড়, সবার লক্ষ্য তখন ডায়াসের দিকে। এবার গান শুরু করবেন বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় প্লে-ব্যাক শিল্পী শঙ্কর চৌধুরী।

আসন গ্রহণ করেই বলাই শুরু করল মিনতির সেই অনুরোধের গান।

'তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন রাশি রাশি
আমি যে তোমার গানের ছন্দ, তুমি যে আমার বাঁশি।'

রাশি রাশি জলতরঙ্গ একসঙ্গে বেজে উঠল যেন। যেমন কণ্ঠ,

তেমনি গায়কী। দুটোই অনবদ্য। সত্যিই তুলনা নেই শিল্পী শঙ্কর চৌধুরীর।

'ওগো প্রিয়া মোর, তুমি যে আমারে করেছ তোমার কবি,
তোমার চোখেতে দেখেছি আমি যে অস্তরবির ছবি।'

মিনতি আত্মহারা। শিল্পী তার অনুরোধ রেখেছেন। এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়?

সত্তি ই তুলনা নেই শঙ্করবাবুব। কি অপূর্ব কণ্ঠ! সুর কখনো সাগরের ঢেউয়ের মত উত্তাল হয়ে উঠছে, পরক্ষণেই আবার তরতর করে নেমে আসছে নিচের মুদারায়। একমাত্র শঙ্কর চৌধুরীব পক্ষেই বুঝি এ জিনিস সম্ভব।

—দেখ দেখ, মিনতির দিকে একবার চেয়ে দেখ। বনশ্রীকে লক্ষ্য করে সহসা ফিস ফিস করে ওঠে বেখা, যেন হাঁ করে গিলছে শঙ্কব চৌধুরীকে।

—চিমটি কাটলেও বোধহয় এখন টের পাবে না। ফুট কাটে অন্য একজন।

—শুধু একজনকে দোষ দিয়ে লাভ কি। এবার বলে অশোকা, তাকিয়ে দেখ একবার শঙ্কর চৌধুরীর দিকে। একমাত্র লক্ষ্য তাব মিনতি। যেন মিনতিকে শোনানোর উদ্দেশ্যেই গান গাইছেন উনি।

এক এক করে দশটা, তবু এতটুকু ক্লান্তি নেই শ্রোতাদেব। আরো চাই। হয়তো এমন সুযোগ জীবনে আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সুতবাং এই অবকাশে যতখানি মন ভরিয়ে নেওয়া যায়।

অদ্ভুত মমতায় মনটা ভবে ওঠে বলাইয়ের।

বেচারা শঙ্কর। আড়ালে বসে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না ওকে করতে হয়েছে এতক্ষণ ধরে। এরই মধ্যেই যেন ঘেমে একেবাবে নেয়ে উঠেছে ছেলেটা। এবার সর্বাগ্রে ওকে একটু বিশ্রা দরকার।

সবদিক বিবেচনা করে মাইকটা টেনে নিয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে জানাল বলাই, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। দয়া কইরা আপনেরা আমারে একটু দম নিতে দেন। বেশি না, মাত্র পনেরো মিনিট। কথা দিতে আছি, তারপরই আবার আমি আপনেগো গান শুনামু।

বিপদ এল অন্যদিক থেকে। হঠাৎ মনোরমা দেবী মাইকে ঘোষণা করলেন, বন্ধুগণ, শিল্পী শঙ্করবাবু যা বলেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। একটানা অনেকক্ষণ গেয়েছেন উনি। ওঁকে এখন একটু বিশ্রাম দেওয়াই উচিত। এই ফাঁকে আমি কলকাতা থেকে আগত প্রখ্যাত কমেডিয়ান বলাই নন্দীকে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে হাস্যকৌতুক পরিবেশন করার জন্য।

ঘোষণা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বলাই।

আশ্চর্য, এ আশঙ্কার কথাটা একটি বারের জন্যও তার মনে হয়নি। শঙ্কর নিজেও কোন সময়ে খেয়াল করেনি। এখন উপায়?

বলাই নন্দীর পক্ষে ঠোঁট মিলিয়ে শঙ্কর চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করাটা কষ্টকর নয়, কিন্তু শঙ্কর চৌধুরীর পক্ষে বলাই নন্দী সেজে হাস্যকৌতুক করাটা যে একেবারে অসম্ভব।

কি করা যায় এখন এ পরিস্থিতিতে?

—ভাই রে, আমাদের বাঁচা। শঙ্করের কাছে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল বলাই, কোনরকমে একটু ঠেকা দিয়া কাম . চালাইয়া দে। যা হয়, মাইকের সামনে গিয়া তুই একটা কথা কইয়া আয়।

—কি পাগলের মত যা-তা বক্‌ছিস্! বিপন্নের মত বলল শঙ্কর, আমি কি কোনদিন কমিক করেছি নাকি যে আজ করব!

—সবই বুঝি রে ভাই, কিন্তু কোন উপায় নাই। কতদিন তো কত জায়গায় আমার কমিক শোনছস্। তার থিকাই মনে কইরা যা হয় তুই একটা কথা কইয়া ফালা।

—অসম্ভব। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।

—পারতেই হইব। দৃঢ়স্বরে বলল বলাই, গইনা গইনা আলাদা

কইরা পাঁচশো টাকা দিছে, অখন না পাবলে মাইরের চোটে থোতার দাঁত খুইলা ফালাইব না! বাঁচতে চাস তো শীগ্‌গীর যা স্টেজের উপর।

কথাটা শেষ কবেই আচমকা শঙ্করকে এক ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল বলাই।

ফল হল মারাত্মক। অপ্রস্তুত শঙ্কর কিছু বুঝে ওঠবার আগেই টাল সাম-াতে না পেরে স্টেজেব ওপর ছিটকে পড়ে একেবারে চিৎপটাং।

হৈ-হৈ করে হেসে উঠল উপস্থিত শ্রোতাব দল। সাধে কি আর কমেডিয়ান বলে! কি অপূর্ব কমিক মাইরি!

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এবার আস্তে আস্তে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শঙ্কর।

সাঁরা মুখ তার বিবর্ণ, রক্তশূন্য। কাঁপছে থবথব করে। চোখের সামনে কেমন যেন সব হাবিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলে মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

—ভাই, যা পাবস্ কইরা ফালা। উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছে বলাই, চুপ কইরা থাকিস না। শুরু কইবা দে। দোহাই ঈশ্বরের। মুখ খোল—

—বন্ধুগণ! এতক্ষণ বাদে মুখ খুলল শঙ্কর, আমি—মানে··· আমি আপনাদের দু'একটা···মানে—মানে—হাসির কথা বলব।

ব্যস, এইটুকুই। তাবপরই একেবারে চুপ। আর একটি কথাও শঙ্কর খুঁজে পেল না বলার মত।

প্রথমে চাপা গুঞ্জন। তাবপরই শ্রোতাদের তরফ থেকে শুরু হল নানাবিধ সরস মন্তব্য।

এটা কে রে! এই নাকি কলকাতার বিখ্যাত কমেডিয়ান! কোন্ জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসেছে কে জানে! বসে পড়ুন মশাই, বসে পড়ুন। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এগিয়ে এল বলাই।

শঙ্করকে সরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে মাইকে ঘোষণা করল, বন্ধুগণ, কমেডিয়ান বলাই নন্দী দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ কইরা মাত্র কিছুক্ষণ আগে এইখানে আইসা পা দিছেন। উনি খুবই ক্লান্ত। তার জন্যই ওনার পক্ষে কিছু কওয়ন সম্ভব হইল না। ওনার বদলে আমিই বরং আপনাগো কিছুক্ষণ কমিক কইরা শুনাইতে আছি।

আর পায় কে বলাইকে। কমিক, বিশেষ করে প্যারডি গানে তার দক্ষতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গাইতে শুরু করে দিল মনেব আনন্দে।

'তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন রাশি রাশি
আমি যে তোমার গানের ছন্দ, তুমি যে খোদার খাসী,
ওগো খেঁদী মোর তুমি যে আমারে করেছ তোমার কবি
তোমার চোখেতে দেখেছি আমি যে শনি ঠাকুরের ছবি।'

হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল শ্রোতার দল।

অপূর্ব! সত্যিই তুলনা নেই শিল্পী শঙ্কর চৌধুরীর ; যেমন গান, তেমনি তার কমিক। দুই-ই সমান। দুই-ই অপূর্ব।

অনুষ্ঠান শেষ হলেও বলাই কিন্তু এত সহজে ছুট পেল না। এগিয়ে এল অসংখ্য অটোগ্রাফ-শিকারীর দল। এতবড় একজন শিল্পীর সই তাদের খাতায় না থাকলে চলবে কেন!

মনের আনন্দে এক এক করে সবার অটোগ্রাফ-খাতায় সই করে যেতে লাগল বলাই।

আর শঙ্কর! অদূরে উপবিষ্ট শঙ্করের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না একবার। আজে-বাজে লোকের সই নিয়ে কি লাভ। ও তো একটা ফালতু মাত্র।

—বাসায় যাবেন না এবার? মিনতির সারা মুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা,—রাত হয়েছে।

—হ, লও যাই। আর দেরি করুম না।

তবু দেরি করতে হল। গুটিকয়েক ছাত্রসহ এগিয়ে এল স্থানীয় ছেলে কলেজের প্রিন্সিপাল সাতকড়িবাবু। শঙ্করকে তারা এত শীগ্‌গীর ছেড়ে দিতে রাজী নন। কাল সন্ধ্যায় তাদের কলেজে শঙ্করকে গাইতেই হবে। তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে তারা প্রস্তুত।

—ঠিক আছে, গামু। সঙ্গে সঙ্গেই বলাই রাজী।

মিনতি আত্মহারা। যাক, বাঁচা গেল। শঙ্করবাবুকে আরো একদিন ধরে রাখা যাবে নিজের কাছে।

কিন্তু তারপর? না, সে কথা ভাবতে পারে না মিনতি। ভাবতে চায়ও না।

ফিরে গিয়ে বলাইকে একা পেয়ে এতক্ষণ বাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ল শঙ্কর,—কেন তুই কাল আবার গাইবি বলে কথা দিয়ে এলি? কেন? কেন? কেন?

—আরে মর! সাফাই গাইতে চেষ্টা করে বলাই, রাজী হমু না ক্যান্। ক্যাশ ডাউন করতে যখন রাজী আছে, তখন বাজী না হওনের কি আছে?

—বাজে কথা রাখ। কি তোর মতলব জানতে চাই।

—তাহলে সত্য কথাই কই। ভাই রে, মানুরে ছাইড়া যাইতে হইব মনে হইলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন ধুকুর-পুকুর করে! তাই তো রাজী হইয়া গেলাম।

—কিন্তু আমাকে কালই ফিরে যেতে হবে।

—পাগল নাকি! তুই গেলে ঠেকা কাম চালাইব কে?

—কিন্তু আমি যে শর্মিলাকে কথা দিয়ে এসেছি।

—তাতে কোন ক্ষতি হইব না। গায়কগোর কথার ঠিক থাকে না, এইটা বেবাকেই জানে।

—মানলাম, কিন্তু বারবার বলে দিয়েছিল, এখানে এসেই একটা টেলিগ্রাম করতে—

—কেন, কোন টেলিগ্রাম আসেনি ?

—কই, না তো !

—মিথ্যেবাদী কোথাকার !

—ওমা ! পিসিমা অবাক, তুই আমাকে মিথ্যেবাদী বলছিস !

—বয়ে গেছে আমাব তোমাকে বলতে !

—তাহলে কাকে বলছিস ? ঘবে কি আর কেউ রয়েছে নাকি এখন ?

—জানিনে, যাও ! লায়াব কোথাকাব।

—ওমা ! এই তো আবাব বললি।

—বলেছি, বেশ করেছি। বাগ কবে পাশেব ঘবে গিয়ে এবাব ছোট ভাই মণ্টুকে প্রশ্ন কবল শর্মিলা, হ্যাঁ বে আমাব কোন টেলিগ্রাম এসেছিল ?

—কই, না তো।

—বিট্রেয়াব !

—মানে ! মণ্টু অবাক, আমি আবাব কখন তোব সঙ্গে বিট্রে কবলাম !

—যা যা ! তোকে আর তর্ক কবতে হবে না।

জামা-কাপড না-ছেড়েই এবাব নিজেব ঘবে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইল শর্মিলা। বিট্রেয়াব। অল বিট্রেযাব। মুখেই শুধু বড বড় কথা। নইলে ওরা সব সমান।

—তোকে একটা কথা বলতে এলাম। পায়ে পায়ে ঘবে ঢুকলেন পিসিমা, অনেকদিন ধবেই বলব বলে ভাবছি, কিন্তু শোনাব মত সময় কোথায় তোব ? বলি, এভাবেই কি বাউণ্ডুলেপনা করে ঘুবে বেড়াবি, নাকি ঘব-সংসাব কববি ? সবটাবই একটা সীমা আছে তো !

—আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। অপ্রসন্ন কণ্ঠে জবাব দিল শর্মিলা, আমার ভাবনা আমিই ভাবতে পারব।

—আর কবে ভাববি শুনি? মুখে যতই বাইশ বছর বলে চালাতে চাসনে কেন, ওদিকে বয়েস যে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, সে খেয়াল আছে? এবার ভাববি কি বুড়ো বয়েসে?

—তার জন্য কি আমাকে ভালভাবে যাচাই না করেই যাকে হোক হুট করে বিয়ে করে ফেলতে হবে?

—আর কত যাচাই করবি শুনি? এর আগেও তো কতজনকে যাচাই ক'রে দেখলি। তাদের মধ্যে একজনকেও কি তোর মনে ধরল না!

—বোগাস্। সব মাটির পুতুল। তাই তো যাচাই না করে যাকে তাকে মেনে নিয়ে নিজের লাইফটাকে আমি নষ্ট করতে রাজী নই।

—তোর বাপ কি তোর মাকে বিয়ে করার আগে যাচাই করে দেখেছিল? নাকি তোব পিসেমশাই বিয়ের আগে আমাকে দেখে-ছিল? কই, তা বলে আমাদের লাইফ তো তোদের মত এমন কথায় কথায় নষ্ট হয়নি।

—তোমাদের কথা ছেড়ে দাও। ওসব সেকেলে জিনিস এখন অচল। এটা প্রোগ্রেসিভ যুগ তা মনে রেখো।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে আজ একজনকে বিয়ে, কাল তাকে তালাক দিয়ে আবাব অন্য একজনকে বিয়ে—এসব আমাদের আমলে কল্পনাও করতে পারতাম না। বয়েসের মেয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত এখানে-ওখানে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, তাও কোনদিন বাপের জন্মে চিন্তা করতে পারিনি। তোদের আমলেই দেখতে হল এসব।

জবাব না দিয়ে রাগ করে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে জোর করে তার মধ্যে মুখ গুঁজে রইল শর্মিলা।

পিসিমার যত কাণ্ড। সেই একঘেয়ে কথা। সব সময় লেগেই আছে পেছনে। ভাল লাগে না বাপু। তার চাইতে দেখা যাক যে

বাইরে থেকে আসা এই ম্যাগাজিনটার মধ্যে স্লাইট চাপা নাক সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে কিনা।

একইভাবে স্থানীয় একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে শঙ্কর। মাত্র মিনিট কয়েক, তারপরই সে ক্ষোভে দুঃখে কাগজটা বলাইয়ের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মন্তব্য করল, যত সব রাবিশ!

—ক্যান্, কি হইল? বলাই অবাক।

—দ্যাখ না সেদিনের রি-ইউনিয়ন উৎসব সম্বন্ধে কি লিখেছে।

--কি লিখছে তুই-ই পড না।

—লিখেছে, 'শঙ্কর চৌধুরীর গান সত্যই অনবদ্য। তাঁর গান অনেকদিন পর্যন্ত শ্রোতাদের মনে থাকবে। শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সুখ্যাতি করতে পারব না কমেডিয়ান বলাই নন্দীকে। এই কি তার হাস্য-কৌতুকের নমুনা?

এর জন্যই কি অতিরিক্ত পাঁচশো টাকা খরচ করে এতদূর থেকে তাঁকে আনা হয়েছিল?

বস্তুত, হাস্য-কৌতুকের নামে তিনি যেভাবে সেদিন লোক হাসিয়েছেন, তাঁকে নিন্দে করার মত ভাষা আমাদের জানা নেই।'

—লেখছে তো কি হইছে! বলাই নির্বিকার, অন্যায় তো কিছু লেখে নাই। তাতে তোর এত রাগ করনের কি আছে?

—মানে! তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল শঙ্কর, শুধু শুধু এভাবে নিন্দে করলে···

—আরে মর্! নিন্দা করছে বলাই নন্দীর, শঙ্কর চৌধুরীর তো আর করে নাই। তাইলে তোর এত পোড়ায় ক্যান্?

—কিন্তু এখানে যে আমাকেই সবাই···

—ছাড়ান দে, ছাড়ান দে। যা হওনের হইয়া গেছে, অখন আর সেই সব কথা ভাইবা লাভ নাই।

—কিন্তু আজ যে আবার ছেলেদের কলেজে···

—বেবাক আমি চালাইয়া দিমু, তোরে তার জন্য ভাবতে হইব না। তুই শুধু আড়াল থিকা ঠেকাকাম চালাইয়া যাইস, তারপর যা কিছু করনের আমিই করুম।

—বেশ, তবে আজই কিন্তু লাস্ট, তা যেন মনে থাকে। কাল এনি হাউ আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

—শুধু তুই ক্যান্, আমিও যামু। থাকতে চাইলেই কি এইখানে আমি থাকতে পারুম চিরদিন! খামু কি?

—একাই যাবি? ঠাট্টা করে বলল শঙ্কর, নাকি তোর মান্নুকেও নিয়ে যাবি সঙ্গে করে?

—কইস্ না রে ভাই, কইস্ না। খামাকা এই কথা কইয়া কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিস না। মান্নুরে সঙ্গে কইরা লইয়া যামু, তেমন কপাল কি আমার হইব কোনদিন? তাইলে শুধু শুধু কইয়া লাভ কি?

পরদিনও ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। যাবার উপায়ও ছিল না।

সকাল তখন প্রায় ন'টা। হঠাৎ ঘরে ঢুকে মিনতি ডাকল, শঙ্করবাবু!

—আমাকে ডাকছেন? ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল শঙ্কর।

—আপনাকে! ভ্রূকুটি দেখা দিল মিনতির চোখে, আপনাকে ডেকেছি কে বললে! আমি তো ডাকছি শঙ্করবাবুকে।

—আরে মর্। পরিস্থিতি সহজ করে দিল বলাই, আমি তো তোমার সামনেই খাড়াইয়া রইছি। কি কইবা, কইয়া ফালাও।

—মা আপনাকে একবার ডাকছেন।

—মাসীমা! সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বলাই, লও যাই শুইনা আসি।

ছোট্ট দাবি মনোরমা দেবীর। স্থানীয় গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বিশেষ করে ধরেছেন। ওখানে একদিন গাইতেই হবে শঙ্করকে। মনোরমা দেবী কথা দিয়ে ফেলেছেন তাঁকে।

—গামু, তার মইধ্যে কি আছে। বলাই সঙ্গে সঙ্গেই রাজী, আপনে যেইখানে কথা দিছেন, সেইখানে আর কোন কথাই থাকতে পারে না। তবে ব্যাপার কি জানেন মাসীমা? ভারনায় পড়ছি ইয়ে···মানে···বলাইরে লইয়া। ও ছটফট করতে আছে ফিরা যাওনের লাইগা।

—তাহলে উনি বরং ফিরে যান। সমাধান করে দিল মিনতি।

—আরে মর্। ও ফিরা গেলে গান হইব কি কইরা?

—কেন? মিনতি অবাক, আপনি তো রয়েছেন।

—হ, আমি তো রইছিই, কিন্তু ঠেকাকাম চালাইব কে?

—ঠেকাকাম! মিনতির দু-চোখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সে আবার কি?

—ঠেকাকাম হইল গিয়া···ঠেকাকাম। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওঠে বলাই, মানে·· মানে তবলার ঠেকা আর কি। শুধু গাইলে আর তো চলবে না, আড়ালে থাইকা তবলায় ঠেকাও তো দিতে হইব। যাউক, ওর জন্য ভাবতে হইব না। ওরে আমি কইয়া বইলা ঠিক কইরা লমু।

—কেমন লাগছে আমাদের এই জায়গাটা? হঠাৎ প্রশ্ন করলেন মনোরমা দেবী।

—খারাপ কি। শুনছি তো ভালই।

—কেন, ঘুরে-ফিরে দেখনি এখনো?

—সময় পাইলাম কই। তাছাড়া চিনি না, জানি না, আন্দাজে কোথায় ঘুরুম কন?

—কেন, মানুই তো রয়েছে। ও-ই সব দেখিয়ে-শুনিয়ে আনবে। চমৎকার জায়গা। দেখলে খুশি হবে।

—ঠিক আছে, দেখুম। কন তো আইজই দুপুরের পরে বাইর হইয়া পড়ুম।

—বেশ তো, তাই যেয়ো।

ঘরে এসে সব কথা খুলে বলতেই রেগে উঠল শঙ্কর। অসম্ভব। তার পক্ষে আর একদিনও দেরি করা সম্ভব নয়।

—ক্যান্, কইলকাতায় এমন কি তোর ঠেকা আছে শুনি? বলাইয়ের কণ্ঠে অনুযোগ, এইখানে রোজ খ্যাপ্ মিলতে আছে। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেইলা···

—তা হোক, তবু আমাকে যেতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে ওখানে।

—হ, কাম যে কি, সে তো আমি ভাল কইরাই জানি। কামের মধ্যে তো খেঁদীর লগে লটরপটর করা···আর দুইবেলা পকেটের টাকা চোট খাওয়া। তা খা। যত খুশি খা। কিন্তু নিজের বেলায় শখ আছে পুরা মাত্রায়, আর অন্যের বুঝি একটু সাধ-আহ্লাদ নাই! তাউলার চুল অর্ধেক পইরা গেল, এরপর কি সাধ-আহ্লাদ মিটামু বুড়া বয়েসে?

—মানলাম। তা, আমি তার জন্য কি করতে পারি বল?

—যা করতে আছস, তাই করবি। পিছে থাইকা ম্যানেজ করবি। তাপ্পী দিবি। ঠেকাকাম চালাবি।

—তাই তো অ্যাদ্দিন ধরে করছি তোর মুখ চেয়ে। কিন্তু সবটারই একটা সীমা আছে তো!

—না, নাই। ভাই রে, সংসারে সব কিছুর সীমা আছে কিন্তু পিরিতের কোন সীমা নাই। তা যদি থাকত তাইলে ও এত

করন গুরুর নিষেধ আছে কিনা। লক্ষ্মী, সোনা, আমার কথা বিশ্বাস কর।

মিনতি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। সারা মুখ আরক্ত। চোখ দুটি ভেজা ভেজা। বুকের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। শঙ্কর যে তার এই ছোট্ট দাবিটাকে এমন করে উপেক্ষা করবে, তা বুঝি তাব স্বপ্নেরও অগোচব ছিল।

—সন্ধ্যা হইয়া আইল। বিপন্নের মত সাফাই গাইতে লাগল বলাই, লও এইবার ফিরা যাই। ওদিকে আবার ঘণ্টাখানেক বাদেই মাইয়া স্কুলে ফাংশন। আবে, গানের জন্য ঘাবড়াও ক্যান্! কত গান শোনতে পার আইজ দেইখা লমু। মুডটা একটু আসুক, তারপর ফাটাইয়া ফালামু না আইজ! লও যাই…

গেট বরাবর আসতেই এগিয়ে এল একটি উঠতি যুবক।

অনেকটা দিলীপকুমারের মত। তেমনি উস্কোখুস্কো চুল, তেমনি বিবহী বিরহী ভাব। চলা-ফেবার ঢংটাও অনেকটা তেমনি। ঠিক যেন জুনিয়ার দিলীপকুমার।

—নমস্কার! এগিয়ে এলেন জুনিয়ার দিলীপকুমার, আমার নাম অমল চক্রবর্তী। ফিল্ম-জার্নালিস্ট। আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য আপনার লাইফটা চাই।

—লাইফ আমাব একটাই। সেইটা আপনেরে কি কইরা দেই কন?

হা-হা করে হেসে উঠলেন জুনিয়ার দিলীপকুমার, সত্যি, কথায় কথায় কি হাসাতেই না পারেন আপনি। যাক, কখন আপনার সুবিধে হবে বলুন?

—আইজ বাদ দিয়া যখন খুশি আইসেন।

—ঠিক আছে, তাহলে কাল আসব নমস্কার।

—নমস্কার। লও যাই ঘরে। ফাংশনের আর দেরি নাই।

বারান্দায় পা দিয়েই মিনতি অবাক।

একা ঘরে শঙ্করের সেই বন্ধু নিজের মনেই গান গেয়ে চলেছেন তন্ময় হয়ে। কি অপূর্ব কণ্ঠ! কি অপূর্ব গাইবার ঢং! মনে হয় ঠিক যেন শঙ্কর।

—হে-হে-হে-হে··· সব কিছু জলবৎ তরল করে দিল বলাই, আমার সাগরেদ। আমিই ওরে তালিম দেই কিনা।

—আশ্চর্য! বিস্ময়ভরে বলল মিনতি, একেবারে একরকম গলা দুজনের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও শক্ত।

—হইব না ক্যান্। কার সাগরেদ দেখতে হইব তো।

এবার শঙ্করকে লক্ষ্য করে হাঁক দিল বলাই, এই মস্তান। মানু কি কয় শোন। আমাগো দুইজনের গলা নাকি একেবারে এক।

—সত্যি, আমি একদম বুঝতে পারিনি। এবার শঙ্করকে লক্ষ্য করে বলল মিনতি, চোখে না দেখলে মনে করতাম, বুঝি শঙ্করবাবুই গান গাইছেন।

—হইব না ক্যান্ কও! জবাব দিল বলাই, অ্যাদ্দিন শিখাইলাম কি তাইলে!

—তা উনি ফাংশনে কমিক না করে গান করেন না কেন?

—কি কইরা করব? এবারও পাশ কাটিয়ে গেল বলাই, আসল ব্যাপারেই যে কাইত্।

—মানে? মিনতি অবাক।

—তাল-কানা। কত শিখাইলাম, কিন্তু এই এক ব্যাপারে ওরে আর মানুষ করতে পারলাম না।

মিনতি অবাক। এমন অপূর্ব কণ্ঠ, এত সুন্দর গায়কী, সে কিনা তাল-কানা! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

সেই একই দৃশ্য দেখা গেল গার্লস স্কুলের ফাংশনে।

দাবির যেন আর শেষ নেই। আর একটা চাই। আর একটা। চলন্তিকা-ছবির হিট গানটা না গাইলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না। তারপর মিতালী, বান্ধবী আর গোধূলির রঙ ছবির গান।

বাধ্য হয়েই বলাইকে তখন বলতে হল, ঠিক আছে, এই গানটা গাইয়া আমি মিনিট দশেক বিশ্রাম করুম। তারপব আবার আপনেগো গান শুনামু কিছুক্ষণ বাদে। বলেই বলাই গান ধরল ঃ

'তুমি যে আমাব প্রথম প্রেমেব স্বপ্ন রাশি বাশি
আমি যে তোমার গানের ছন্দ, তুমি যে আমাব বাঁশি।'

একেবারে প্রথম সাবিতেই মিনতি। অধুনা প্রতিটি আসরে তার হাজির থাকা চাই-ই।

বলাই গান ধবতেই এবাব সে সবাব অলক্ষ্যে এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে।

শঙ্কর ক্লান্ত, তা বলে অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে কেন? শঙ্করের বন্ধু বলাইবাবু এই ফাঁকে দু-একটা গান গেয়ে শোনাক না।

অমন যার কণ্ঠ, তাব গান মোটেই খাবাপ লাগবার কথা নয়। দেখাই যাক না, বলে-কয়ে রাজী করানো যায় কিনা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্টেজে যাওয়া আর সম্ভব হল না মিনতির পক্ষে।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠতে না উঠতেই বাধা দিল কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা। শিল্পীব নির্দেশ! স্টেজে যাওয়া চলবে না!

বাধ্য হয়েই মিনতি আবার ফিরে গেল যথাস্থানে। ওদিকে বলাই তখন গেয়ে চলেছে...

'ওগো প্রিয়া মোর, তুমি যে আমারে করেছ তোমাব কবি
তোমার চোখেতে দেখেছি আমি যে অস্তরবির ছবি॥'

রাত সাড়ে দশটা নাগাত সবাই ফিরে এল ফাংশন থেকে।

এখানেই শেষ হল না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি শঙ্করকে পৌর-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছুক। তার জন্য সবাইকে আরো একদিন থাকতে হবে এখানে।

বলাই কেমন যেন আনমনা। বেশ বোঝা যায়, কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তার ভেতরে ভেতরে।

—কি রে? প্রশ্ন করল শঙ্কর, কি ভাবছিস এত?

—ভাবছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া খালি সুতার পর সুতা ছাইড়া চলছি, অখন ভয় হয় যে ঘুড়ি না কাইটা যায়।

—কেন, কি হল?

—আর কস্ ক্যান্। এমন বেকায়দায় পড়ছিলাম যে, কি কমু। বেড়াইতে গিয়া আমারে কয় যে, এউক্কা গান শোনাও।

—বলিস কি রে! হা-হা করে হেসে উঠল শঙ্কর।

—তবে আর কইতে আছি কি। অনেক কষ্টে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত তাপ্পী দিয়া ম্যানেজ করছি। যাউক, অখন কামের কথা কই। ওদিকে আর কোন ঝুট-ঝামেলা নাই। অখন লক্ষ্মী পোলার মত বরকর্তা সাইজ্যা মাসীমা রে কইয়া আসল কামটা চুকাইয়া দে।

—কিন্তু কাজটা কি ভাল হবে বলাই?

—ক্যান্, খারাপ হওনের কি আছে? মানুষ যখন আপত্তি নাই…

—মানলাম, কিন্তু মানু জানে না যে, তুই শঙ্কর। আজ হোক, কাল হোক, ভুলটা একদিন তার চোখে ধরা পড়বেই। সব কথা শোনার পরে সে কি তোকে আর কোনদিন বিশ্বাস করতে পারবে? ক্ষমা করতে পারবে? ভালবাসতে পারবে?

কটাক্ষ হানল রেখা, বেচারারা এখানে এসে একটু নিরিবিলিতে বরং বসেছিল, তা তোরা এলি কিনা ওদের জ্বালাতে।

—যা বলেছিস! হঠাৎ মিনতির গাল টিপে দিয়ে বলল তপতী, কিছু মনে করিসনে ভাই। আমরা ওদিকে সরে যাচ্ছি।

—সেই ভাল। এখানে থেকে আর ওদের ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না। এই, চল সবাই এখান থেকে। ওদের একটু নিরিবিলিতে থাকতে দে।

কোন কথাই যোগালো না মিনতির মুখে। কি বলবে! বলার আছেই বা কি! হঠাৎ ওরা যে এখানে এসে হাজির হবে, তা কে জানত।

পরদিনই বলাইয়ের ডাক পড়ল মনোরমা দেবীর ঘরে।

প্রথমে ভূমিকা। আর কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে গেলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। শহরবাসীদের ইচ্ছাও তাই।

তারপর আসল কথা। সব কিছুই তিনি শুনেছেন কলেজের অধ্যাপিকা বান্ধবীদের কাছে। মানুষ চাইতে প্রিয় সংসারে তাঁর কেউ নেই। তার যেখানে পছন্দ, সেখানে কোনদিক থেকে আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখন এ-পক্ষের সম্মতি পেলেই যত শীগ্‌গীর সম্ভব, কাজটা তিনি চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক।

—আমি আর কি কমু! লজ্জা পেয়ে বলল বলাই, যা আপনে ভাল বোঝেন, করেন।

—আসছে সপ্তাহে সোমবার ভাল দিন আছে। বল তো সেদিনই…

—আপনে যা কইবেন তাই হইব। সহসা শুভ বুদ্ধিটা ভেতর থেকে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে বলাইয়ের, কিন্তু পরে যাতে গোলমাল

না হয়, সেইজন্য আগের থিকাই আপনেরে একখান কথা খুইলা কওয়ন দরকার।

—আমি সবই জানি বাবা। হাসলেন মনোরমা দেবী, মান্নু আমাকে সব কথাই খুলে বলেছে। খুব ছেলে যা হোক! আমি তো বুঝতেই পারিনি কিছু। দেখালে বটে!

—কি করুম কন। কতকটা জবাবদিহির মতই বলল বলাই, জন্মে কেউ কোনদিন আমারে একটু সোহাগ কইরা কথা কয় নাই। সেইখানে আপনেরা বেবাকে মিলা আমারে লইয়া এমন নাচানাচি শুরু কইরা দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত লোভে পইড়া আকাম কইরা ফালাইলাম।

—ঠিক আছে, তার জন্য আটকাবে না। মান্নুর যেখানে পছন্দ, সেখানে আর কোন কথাই থাকতে পারে না। কিন্তু একটা কথা বাবা। মান্নুর পরিচয় তুমি শুনেছ? আমি…আমি…তার মা নই।

—কোন্ হালায় কয়! সব কিছু ভুলে গিয়ে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল বলাই, মা না হইলে এইভাবে বুকে কইরা আপনে তারে মানুষ করলেন কেমনে! সেদিক থিকা দেখতে গেলে আপনে তো আমাগো ডবল মা।

—খুব খুশি হলাম বাবা। চোখের জল মুছে বললেন মনোরমা দেবী, যাক তাহলে ঐ কথাই রইল। আসছে সোমবার।

আর, যায় কোথায়। নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে গিয়েই একেবারে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলল বলাই। —সোমবার! সোমবার! আসছে সোমবার বিয়া। বেবাক ফাইনাল।

—বিয়ে! শঙ্কর কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়াল সাংবাদিক অমল চক্রবর্তী, কার বিয়ে?

—আপনে! মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল বলাই, আপনে কখন আইলেন?

আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে। একবেলা খেয়ে থাকব সেও বরং ভাল, তবু তোর এখানে আর নয়।

—চুপ কর বলছি। সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল শর্মিলা, সব সময় খালি পেছনে লেগেই রয়েছে। বিট্রেয়ার। চিটিংবাজ।

—ঢের হয়েছে। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, চিটিংবাজ, কিছুই তো আর বলতে বাকি রাখলিনে। এবার ক্ষ্যামা দে, তারপর তোর ঘর-বাড়ি নিয়ে তুই-ই থাক।

—জ্বালাতন আর কি। রাগ করে পিসিমার কাছ থেকে দূরে সরে নিজের মনেই গজ গজ করতে লাগল শর্মিলা। ধাপ্পাবাজ। ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাওনি। দাঁড়াও, তোমার ধাপ্পাবাজীটা আমি বার করছি। এব জবাব যদি দিতে না পারি তো আমার নাম শর্মিলাই নয়।

গোটা শহরটাই বুঝি ভেঙে পড়েছে মনোরমা দেবীর কোয়ার্টারের সামনে। আজ মিনতির বিয়ে।

কোনদিক থেকেই আয়োজনের কোন ক্রটি নেই। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছেন বি[illegible]ত আমন্ত্রিত হয়ে। লগ্ন আসন্ন। এবার শুরু হবে অনুষ্ঠান।

আলো-ঝলমল বিরাট প্যাণ্ডেল। বাইরে দাঁড়িয়ে শঙ্কর। রীতিমত সাজ সজ্জা করে সবাইকে সে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভেতরের দিকে। বলাই তার বন্ধু। বরকর্তা হিসেবে এ যে তার কর্তব্য।

সহসা কি শুনে কান দুটো সজাগ হয়ে ওঠে শঙ্করের।

কিসের যেন একটা চাপা কোলাহল ভেসে আসছে দূর থেকে। শব্দটা এদিকেই যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। কি ব্যাপার?

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, পরক্ষণেই কি দেখে সারা দেহ অসাড় হয়ে গেল শঙ্করের।

কে! কে এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখের সামনে! এ কি চোখের ভুল, নাকি অসুস্থ চিত্তের মায়াবিভ্রম?

আবার চাইল পরিপূর্ণভাবে। না, ভুল নয়। এত কাছ থেকে নিজের লোককে চিনতে কেউ ভুল করে না।

শর্মিলা। মুখোমুখি দাঁড়ানো মেয়েটি শর্মিলা ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু এ কোন্ শর্মিলা! সারামুখ আরক্ত! বিস্ফারিত দুটি চোখ। হাঁপাচ্ছে অসহ্য উত্তেজনায়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে হয়, হঠাৎ একটা স্নায়বিক উত্তেজনা যেন ওর দেহের স্তরে স্তরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে উঠেছে।

—এই যে! শঙ্করের চোখে চোখ পড়তেই উন্মত্তের মত ফুঁসে উঠল শর্মিলা, রাস্কেল! দাঁড়াও, তোমার বিয়ে করাটা আমি বার করছি।

—তু-তু-তুমি কি বলছ শর্মিলা! ভয়ে প্যাণ্ডেলের দিকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল শঙ্কর, আ-আ-আমি···মানে আমি···

—হ্যাঁ তুমি! ক্ষিপ্তের মত এগোতে লাগল শর্মিলা, এত বড় সাহস! আমাকে ফাঁকি দিয়ে এখানে কিনা তলে তলে এই কাণ্ড! তাই তো ভাবি যে অ্যাদ্দিনের মধ্যেও কোন চিঠি-পত্র নেই কেন!

—মা-মানে···মানে···আমার কথাটা একবার··· ভয়ে ভয়ে আরো খানিকটা প্যাণ্ডেলের মধ্যে ঢুকে গেল শঙ্কর, দয়া করে শোন যদি···

—কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। আহত জন্তুর মত গর্জন করে আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে এল শর্মিলা, কেন আমাকে দিনের পর দিন এভাবে-ব্লাফ দেওয়া হয়েছিল তা আমি জানতে চাই।

—ব্লাফ আমি দিইনি। ভয়ে ভয়ে ক্রমশই প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে লাগল শঙ্কর, প্লীজ আ-আ-আমাকে বলতে দাও।

—শাট আপ। শর্মিলাও সেই একইভাবে এগিয়ে আসতে লাগল প্যাণ্ডেলের ভেতরে, কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। ধাপ্পাবাজ, ইতর, মিথ্যেবাদী কোথাকার! আজ এমন শিক্ষা দেব যে…

আত্মরক্ষার তাগিদে আবো খানিকটা পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল শঙ্কর, কিন্তু সব বৃথা। আর পিছিয়ে যাবার পথ নেই। প্যাণ্ডেলের সেখানেই শেষ।

বেগতিক দেখে এবার অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা মনোরমা দেবীর কোয়ার্টারের দিকে দৌড় দিল শঙ্কর।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করল শর্মিলা।

মুখে তার সেই একই কথা। আজ ওরই একদিন, কি আমারই একদিন। ধাপ্পা দেবার মজাটা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেব। এমন শিক্ষা দেব যে জন্মেও যেন আর কোনদিন কাউকে ধাপ্পা দিতে সাহস না পায়।

ওদিকে বিয়ে ততক্ষণে শেষ। বব-বধূকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট ঘরের অভ্যন্তরে।

চারিদিকে তাকিয়ে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে এবার তাদের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন কবল শঙ্কব। দেখা যাক, এবার যদি বাঘিনীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সব বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে উন্মত্তের মত ফুঁসে উঠল শর্মিলা, পালাবে কোথায়? আগে আমার কথার জবাব চাই, তাবপর অন্যকথা। এ কি!

বরবেশী বলাইকে দেখেই সহসা থমকে দাঁড়াল শর্মিলা।

এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! কাগজে ছাপা হয়েছিল শঙ্করের বিয়ের কথা, কিন্তু এ যে দেখা যাচ্ছে অন্য লোক।

বলাই অসাড়, নিস্পন্দ। কাঁপছে থর থর করে। চোখের সামনে রক্ত-খেকো বাঘিনী। কি করা যায় এখন!

শর্মিলা'র চোখে তখনো ঘোর ঘোর দৃষ্টি।

কি ব্যাপার! শঙ্করের পরিবর্তে বরবেশে দেখা যাচ্ছে বলাইকে। তাহলে আসল বর কে? শঙ্কর, না, বলাই?

—আ-আইজ্ঞা…আ-আ-আমি…ইডিয়েট। ভড়কে গিয়ে এবার মিনতিকে দেখিয়ে বলল বলাই, আর এই হইল গিয়া আমার… আমার…আমার খেঁদী।

আরো যেন কি বলতে চেয়েছিল বলাই, কিন্তু তা আর শোনা গেল না। তার আগেই সব কিছু চাপা পড়ে গেল সবার সমবেত হাসির আড়ালে।

াই আমি

া,

॥ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বহুরূপীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা ॥

বিশ্বাস করুন, আমি কোনদিনও প্রেমে পড়িনি।

না না, ঠাট্টা নয়। দু-চোখ ছুঁয়ে বলছি। সত্যিই আমি কোনদিন প্রেমে পড়িনি। চান্সই পাইনি।

অথচ এ যুগে কে না প্রেমে পড়েছে! ঘণ্টে, মানকে, হ্যাবলা, পুঁচকে, কে না দু-চার গণ্ডা প্রেম করতে বাকি রেখেছে। এমন কি পয়লা নম্বরের ক্যাবলাকান্ত ছেলে আমাদের গন্‌শাও নাকি এরি মধ্যেই ওসব পাট চুকিয়ে ফেলেছে। প্রতিদানও নাকি পেয়েছে যথাযথভাবেই।

অপরপক্ষও পিছিয়ে নেই। টেঁপি, বুঁচি, খেঁদি, বাতাসী সবাই আজ হিরোইন। সবাই বৈজয়ন্তীমালা। সবাই সাধনা, আশা পারেখ বা সায়রা বানু।

তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে আমাদের ক্ষেন্তি। কতই বা বয় সবেমাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। অথচ এরি মধ্যেই নাকি সবাইকে ছাপিয়ে বেশ একটু নাম করে ফেলেছে।

কারণও আছে। বড়দি সিলভার জুবিলী করেছে। মেজদি গোল্ডেন পেরিয়ে গেছে। সেজদি গত সপ্তাহে সেই যে পাকাদার সঙ্গে সিনেমায় গেছে, তারপর এ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি। এ অবস্থায় ক্ষেন্তি যে এরি মধ্যেই শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সেঞ্চুরী করে ফেলবে, তাতে আর বিচিত্র কি।

সুবিধেও আছে। আগেকার দিনে পান থেকে চুন খসলেই হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃদেবের সিংহনাদ, 'বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। এমন কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চাইতে না-থাকাও ভাল।'

অপরপক্ষও কম যান না। সেখানেও সেই ব্যাঘ্র হুঙ্কার, 'কই!

কই সেই কুলমজানী মেয়েটা! ডাক ওকে। হারামজাদীকে দু-টুকরো করে কেটে আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।'

এখনকার ফাদার-মাদাররা এসব ব্যাপারে ভারি লিবারেল। ভাবটা এই যে—করুক, যত খুশি করুক। একটার পর একটা করুক। তবে হ্যাঁ, শুধু চার ফেললেই চলবে না। বেশ মালদাব কই-কাতলা গাঁথা চাই। দু-চারটে হয়তো সুতো ছিঁড়ে বেবিয়ে যাবে, তা যা'ক। তাতে হতাশ হবার মত কিছু নেই। অধ্যবসায় থাকলে একটা না একটা লেগে যাবেই।

দেখে দেখে কেমন যেন জেদ চেপে গেল। সবাই যদি প্রেমে পড়তে পারে তো আমিই বা এমন ফ্যালনা হলাম কিসে মশাই! সুতরাং আমিও প্রেমে পড়ব। হাজাববার পড়ব। এক্ষুনি পডব। তাতে কার কি!

যে-কথা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে টাকা ধার করে ন-পাইপ পোশাক আর একজোড়া সরুমুখো জুতো কিনে লাম। বিবিধ ভারতী শুনে গোটাকয়েক গানও ঠোটস্থ করে গম বেশ লাগতাই ধরনের। মুখে আঙুল দিয়ে সুঁই সুঁই করে সিটি দেবার কায়দাটাও আয়ত্ত করে নিলাম খুব অল্প সময়েব মধ্যেই। এবার 'গাথা বহে মেবা দিল' গাইতে গাইতে জায়গা বুঝে দিলীপকুমারের মত একখানা পোজ ঝেড়ে দিতে পারলেই, ব্যস্।

কিন্তু না, সুবিধে হল না। সবত্র এক বব—'নো ভ্যাকান্সী।' সবাই বুক্‌ড। সবাই বিজি। বোঝা গেল যে জন্মের আগে থেকে সীট বুক করে রাখতে না পারলে এ যুগে হিরোইন পাবার আর কোন চান্সই নেই।

বহুরূপীকে বেকুব হতে দেখে গোটা অফিস জুড়ে তখন সে কি আনন্দ! সে কি ঠাট্টা-বিদ্রূপ! যেন প্রেমে পড়তে না পেরে মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি আর কি।

দেখে পিত্তি জলে গেল। প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এর প্রতিশোধ

আমি নেবো। সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে, আমিও প্রেমে পড়তে জানি।

আর প্রেমে পড়া এমন কি-ই বা শক্ত কাজ! এই তো সেদিন একটা ছবিতে দেখে এলাম, নায়ক-নায়িকা একে অন্যকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিব্বি প্রেমে পড়ে গেল। অর্থাৎ, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ হুট করে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল, ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম। তা চেষ্টা করলে আমিই কি কাউকে গুঁতিয়ে দিতে পারবো না। খুব পারবো।

যে কথা, সেই কাজ। সেদিনই বিকেলে শ্যামবাজারের মোড়ে একজনকে গুঁতিয়ে দিলাম। আরে বাসরে বাস্! না না, যা ভেবেছেন তা নয়। তার আগেই দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

পালিয়ে এসেও শান্তি পেলাম না। সবাই প্রেম করবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো, এ অসহ্য! যেমন করে হোক প্রেমে আমাকে পড়তেই হবে।

দি আইডিয়া! হিন্দি ছবির নায়কদের মতো নায়িকাকে দেখেই গান ধরে দিলে কেমন হয়। ওদের দেশের প্রেমিকারা কিন্তু ভারি অ্যাডভান্সড। গান শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রেমে পড়ে যায়। তা আমার বেলাই যে এমন কিছু হবে না, তা কে বলতে পারে। দেখাই যাকনা চেষ্টা করে।

ব্যস্, পরের দিনই একজনকে দেখে গান ধরে দিলাম, 'বোঝনা কেন, আমি যে বড় একা।'

সঙ্গে সঙ্গেই ফিক করে হেসে মেয়েটি জবাব দিল, 'উঁহু, ভুল হয়েছে। ওটা হবে, 'আমি যে বড় বোকা।'

দেখুন কাণ্ড! এক ফোঁটা পুঁচকে মেয়ে—সেও কি না মুখের ওপর কটকট করে কথা শোনায়। সামান্য এটিকেট পর্যন্ত জানে না। তবে আমি চুপ করে বসে থাকবো না। একটার পর একটা চেষ্টা করে যাবোই।

আচ্ছা, চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে সেজে গেলে কেমন হয়। অধুনা বেশির ভাগ ছবিতেই দেখা যায় যে, বাউণ্ডুলেদের প্রতি একালের নায়িকাদের ভারি ঝোঁক। কাজের মধ্যে একমাত্র কায়দা করে সিগ্রেট টানা ও অকারণে কাটা কাটা কথা বলা, অথচ এ হেন গুণধর নায়কের জন্যই নায়িকার সে কি আকুলিবিকুলি। তাই যদি হয় তো বাউণ্ডুলে হওয়াই বা এমন কি খারাপ। দেখাই যাকনা লাক ট্রা·' করে।

ব্যস্, বাউণ্ডুলে হয়ে গেলাম। বাউণ্ডুলেদের বিশেষত্বগুলোও সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে ফেললাম। কিন্তু না দাদা, সুবিধে হল না। বরং উল্টো আমাকে—যাক্‌গে সে দুঃখের কথা বলে আর লাভ নেই। তবে একি অন্যায় বলুন তো। হিরোদের বেলায় একই সঙ্গে রাজত্ব ও রাজকন্যে লাভ, আর আমার বেলায় কিনা লালবাজার।

নাঃ। স্বাধীন দেশে বাস করাও দেখছি একটা ঝকমারি। এর চেয়ে বিলেত বা অ্যামেরিকা ঢের ভালো। তবে আমি হার মানবো না। জয়ী আমি হবোই।

উপায় বাতলে দিল বন্ধু ন্যাড়া। প্রেমের ব্যাপারে ন্যাড়া সত্যিই অথারিটি। জীবনে সে অনেক প্রেম করেছে। যত না ঘায়েল হয়েছে তার চেয়ে ঘায়েল করেছে ঢের বেশি।

সব শুনে সে বলল, এই ব্যাপার! তা অ্যাদ্দিন আমাকে বলিসনি কেন। ঠিক আছে। প্রেম করবার একটা সিওর ট্রিপ তোকে সবাই ·ল দিচ্ছি। মনে বাখবি, 'একালের মেয়েরা ছোট্ট ও মিষ্টি সীট ·স্বাধনের ভারি ভক্ত। তাই কক্ষনো যেন ওদের পুরো নাম ধবে চাল্লই ·কবিনে। ডাকবি ছোট্ট ও মিষ্টি করে। যেমন পার্বতীকে পারু, রমলাকে রমা, মিনাকে মিনু, ডলিকে ডল—ঠিক এভাবে। দেখবি· আ' ওরা তাতে কি খুশি হয়। আরে আমি তো এই করেই সতেরোর কোঠা পার করে দিলাম। তা তুই-ও একটার পর একটা ট্রাই করে যা, দেখবি দু-চারটে লেগে যাবেই।'

ব্যস্, মাব দিয়া কেল্লা। সিওর ট্রিপ পেয়ে গেছি, আর ঌ.
ভাবনা কি। পরদিনই ক্যাবলার ভাগ্নী কমলার প্রেমে পড়ে গেলাম।
দেখা যাক, এবার কি হয়।

সিনেমা ও নাইলনের পালা শেষ কবে একদিন অবসর বুঝে বললাম, 'কলা, তোমাকে আমি ভালোবাসি কলা।' কি বলবো দাদা, কলা সেই যে কলা দেখিয়ে চলে গেল, আর তার নো পাত্তা। কিন্তু আপনারাই বলুন যে, কমলাকে কলা বলে আমি কি কোন অন্যায় করেছি। তাহলে বমলাই বা রমা হবে কি কবে।

কমলাব পবে মানসী। বেশ মেয়েটি। সুযোগ বুঝে একদিন ওর মানসী নামটাকে ছোট্ট করে নিয়ে ভাবাবেগে বললাম, 'মাসী, আমি তোমাকে ভালোবাসি মাসী।'

ব্যস্, মানসীও কাট্। যাবাব আগে বলে গেল, আমাকে নাকি রাঁচী পাঠানো উচিত। এর কোন মানে হয়! আপনারাই বলুন।

তারপব এলো হাসি মজুমদার। এক জোছনা রাত্রে হাসিব হাতখানি নিজেব মুঠিতে তুলে নিয়ে ডাকলাম, 'হিস্থ, আমার দিকে তাকাও হিস্থ।'

ব্যস্, খতম। মিনা মিনু হলেও হাসি যে হিস্থ হতে পারে না তা আমাব সত্যিই জানা ছিল না। কিন্তু একি অন্যায় বলুন তো! চলেই যদি যাবি তো, আমাব দেয়া নাইলনগুলো সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন? যাবাব আগে ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেলেই তো পারতিস! অন্তত পরেব বাবেব খবচটা তাতে বেঁচে যেতো।

তারপর এলো সাগব সেন। ভারি মিষ্টি মেয়ে। সবচেয়ে মিষ্টি ওর আধো আধো কথাগুলো। যেমন—সকালকে ছকাল, বহুরূপীকে বহুলুপী, চাদরকে চাদল ইত্যাদি।

ভাবলাম যে ভালোই হলো। আমি ওর সঙ্গে ঠিক এমনি করেই কথা বলবো। তাতে নিশ্চয়ই ও খুব খুশি হবে।

অবশেষে একদিন সেই সুযোগ এল। ঘরে মাত্র আমরা দুজন। নীরবতা ভেঙে সাগরই প্রথম কথা বলল, 'জানো বহুলুপীদা, আমি সব চেয়ে বেছি ভালোবাছি উত্তমকুমালকে, তারপরই তোমাকে। তুমি কাকে বেছি ভালোবাছো, বলো না বহুলুপীদা ?'

এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই ওর মত করে বললাম, 'ছাগল, আমি ছুধু তোমাকেই ভালোবাছি ছাগল।'

—কি! এতদূর ছাহছ! বেলিয়ে যাও। বেলিয়ে যাও আমাল ঘর থেকে। গেট আউট। উঃ! আমাকে বলে কিনা ছাগল!

লে হালুয়া! কি বলতে চাইলাম, আর কি বুঝে বসল। নিজের বেলায় সকালকে ছকাল, চাদরকে চাদল বললে দোষ হয় না, আর আমি সাগরকে ছাগল বললেই কিনা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।

যাক, দুঃখ করে লাভ নেই। এক মাঘে শীত যায় না। আমারও দিন আসবে। তখন দেখা যাবে।

আশ্চর্য, বলতে না বলতেই সুযোগ এসে গেল। কথায় কথায় অফিস সহকর্মী রবি বোস সেদিন জানালেন, 'গৌরী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্ধ্যে সাতটা নাগাত আসবে বলেছে।'

গৌরী! সঙ্গে সঙ্গে ফট্ করে প্রেমে পড়ে গেলাম। আহা, কি মিষ্টি নাম! নিশ্চয়ই কোন সদ্য-প্রস্ফুটিতা সপ্তদশী তরুণী। নাম শুনেই বেশ অনুমান করা যায়।

কি বলব দাদা, সারাদিন কাজে মন বসল না। একই স্বপ্ন বুকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল বারবার। গৌরী! প্রেয়সী গৌরী! নিশ্চয় সে আমার প্রেমে পড়েছে, নইলে হঠাৎ এভাবে আলাপ করতে চাইবে কেন।

বারবার তাকাতে লাগলাম ঘড়ির দিকে। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কুরকুর শব্দ। আর মাত্র মিনিট খানেক বাকি। তারপরই গৌরী আসবে। আমার পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়া—গৌরী।

হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। কে এই লোকটা জীবনের পরমলগ্নে এগিয়ে এল ব্যাগড়া দিতে। না, এই মুহূর্তে একমাত্র গৌরী ছাড়া আর কাউকেই আমি চাইনে। শুধু আমরা দুজন। আমি আর গৌরী।

উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ একটা রূঢ়স্বরেই বললাম, 'কে মশাই আপনি?'

—আমার নাম গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

এ্যাঁ! গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার! গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম ধপাস করে। হায় ভগবান, এই কিনা আমার প্রথম প্রেয়সী গৌরী! এই সাড়ে সাত ফুট লম্বা হরধনু আকৃতির গৌরীকে কেন্দ্র করেই কিনা আমি সারাদিন স্বপ্নজাল বুনে চলেছিলাম মনে মনে! নাঃ! এর চাইতে লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাওয়াও বুঝি ভাল ছিল।

ভাবলাম যে আর নয়। খুব শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু স্বভাবদোষ যাবে কোথায়। তাই আবার অঘটন ঘটল দিন কয়েক বাদেই। সেদিন প্রফুল্ল বোস হঠাৎ বললেন, 'ছুটির পরে চলে যাবেন না যেন। আজ সেবা আসবে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।'

কি বলব দাদা, নাম শুনেই প্রেমে পড়ে গেলাম। সেবা। মমতাময়ী সেবা। সে শুধু দিতেই জানে, নিতে জানে না। নাঃ! গৌরীর চাইতে সেবা অনেক ভাল। অনেক মিষ্টি।

যথাসময়ে সেবা এলেন আবার চলেও গেলেন। শুধু যাবার আগে বহুরূপীর প্রেমের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন। আচ্ছা, আমার কি দোষ বলুন তো? সেবা যে আসলে সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্ত হবে, তা কি আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলাম কোন সময়ে! আপনারাই কি পেরেছিলেন!

এরপর এলেন সবিতা। সেই একই ব্যাপার। একই আকুলতা। তারপরই সব স্থির। আরে বাপরে বাপ! সে কি বুকের ছাতি!

সে কি হাতের গুলি। ও হাত দিয়ে কায়দা মত একখানা ঝেড়ে দিলে আমি আর নেই।

তবে লোকটি ভাল। যাবার আগে যথেষ্ট ভদ্রতা করে বললেন, 'যাবেন একদিন আমাদের রূপকারের "ব্যাপিকা বিদায়" নাটক দেখতে। গিয়ে আমার নাম সবিতাব্রত দত্ত বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে।'

ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। খুব শিক্ষা হয়েছে। আর নয়। আর যদি কোনদিন প্রেম করি তো দস্তুরমত আটঘাট বেঁধেই করব। করলামও তাই। এবার সে কথাই আপনাদের বলব।

বাসরঘর। চুপচাপ বসে আছি আমি ও আমার নব-বিবাহিতা পত্নী পদির মা। মনে দুর্জয় সাহস। এবার আর আমাকে পায় কে! এখন আমি যত খুশি প্রেম করতে পারি। তবে এখন নয়। আগে ভালো করে পরিচয় হোক, তারপর।

পদির মার ভালো নাম কাত্যায়ণী। নামটাকে ছোট করে নিয়ে বেশ খোস মেজাজে ডাকলাম, 'কানি, ঘোমটা খোল কানি।'

দেড়হাত ঘোমটা টানা জীবন্ত পুঁটলীটা থেকে কোন সাড়াই মিললো না। কথাটা কানে গেল কিনা তাও যেন ঠিক বোঝা গেল না। প্রেম গদগদ স্বরে আবার বললাম, 'আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ কানি?'

এবার জবাব এল, 'যে আমারে কানি কয়, তার বাপে কানি, তার মায় কানি, তার চৌদ্দ পুরুষ কানি।'

ব্যস্, আর কিছু বলিনি। জীবনে সেই আমার শেষ প্রেম।

সিনেমা জগৎ—চৈত্র, ১৮৮১।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে আমি [illegible] চিঠি পেয়েছি না-দেখা এক দিদিভাইয়ের কাছ থেকে।

নাম! উঁহুঁ, বলব না। বললে রেগে যাবে। ধরুন তার নাম, মিতা বা অমিতা। অথবা শমিতা।

ভারি মজার চিঠি। লিখেছে, 'আমাদের সবার আন্তরিক অনুরোধ, আপনি একবার এখানে বেড়াতে আসুন। আর আপনি কি খেতে ভালবাসেন জানাবেন।'

শক্ত প্রশ্ন। আরো শক্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কারণ, সত্যি বলতে গেলে এ ব্যাপারে আজকের দিনের মানুষের সঙ্গে আমার খুব একটা বেশি তফাত নেই। সেখানে হক্‌কথা বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে, 'আমি ঘুষ খেতে ভালবাসি।'

কিন্তু সবাইকে তো আর সে-কথা বলা যায় না। বিশেষ করে দিদিভাইকে। হাজার হোক একটা প্রেস্টিজ আছে তো! তাই ঠাট্টা করে জানালাম, 'আমি লপ্‌সী খেতে ভালবাসি।'

লপ্‌সী কাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন না? জানবেন কি করে। এমন জিনিস খাবার মত সৌভাগ্য সংসারে ক'জনের হয় বলুন?

যাক, আমিই বলছি। লপ্‌সী হল, খুদ, ডাল, কাঁকর, পাথরের টুকরো ও লতাপাতা সহযোগে একটি অতি উপাদেয় খাদ্য, যা জেলখানার তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের রোজকার বরাদ্দ। এ খাবার যে একবার খেয়েছে, জন্মেও বোধকরি তা সে ভুলতে পারবে না। যেমন তখনকার সময়ের বাংলার বিপ্লবীরা। সেই কবেকার কথা, তবু আজো বোধহয় তাঁরা শিউরে ওঠেন লপ্‌সীর কথা মনে হলে।

আপনাদের মত দিদিভাইয়েরও তথ্যটা জানা ছিল না। কিন্তু সে-কথা সে স্বীকার করবে কেন? স্বীকার করা মানেই তো

নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করা। সুতরাং আবার চিঠি এল তার কাছ থেকে।

লিখেছে, 'যত শীগ্‌গীর সম্ভব আপনি এখানে চলে আসুন বহুরূপীদা। কথা দিচ্ছি, রোজ দুবেলা আমি আপনাকে লপ্‌সী খাওয়াব। জানেন, আমিও লপ্‌সী খেতে খুব ভালবাসি। আমার মা খুব ভাল লপ্‌সী তৈরি করতে পারেন।'

বুঝুন তো! মিষ্টি নয়, মেঠাই নয়, শেষে কিনা লপ্‌সী খাবার জন্য আমন্ত্রণ! বরাত আর কাকে বলে!

একই অবস্থায় আজ পড়তে হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানকে। ভদ্রলোক নাকি বিদ্যাসাগর কে, তা জানেন না। তাই নিয়ে লোকসভায় তুলকালাম কাণ্ড।

খুব স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের গার্জেন হয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে জানেন না, এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু একটা কথা। আজ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কে, অথবা মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম কি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় সদস্যরা তার ঝট্‌পট্‌ উত্তর দিতে পারবেন তো?

অবশ্য চিত্রনট-নটী হলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে রাজকাপুর, দিলীপকুমার বা শিবাজী গণেশনের নামটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু লেখক বা কবি! রক্ষে করুন।

আরো একটা প্রশ্ন। যদিও ব্যাপারটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে, মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগর কে, তা জানেন না। ক'জন বাঙালী বিদ্যাসাগরকে জানে, আমাকে তার কোন সঠিক হিসেব দিতে পারেন কি কেউ?

বরং বাংলাদেশের এমন আচ্ছা আচ্ছা অনেক হরিদাস পালকে আমি জানি, যাদের জ্ঞানকাণ্ডের বহর দেখলে মাস্টারমশাইকে পর্যন্ত মুখ লুকোতে হবে লজ্জা পেয়ে।

সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি শুনুন।

বছর পনেরো আগের কথা। দাবি করা হল, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক।

তারপর? কি উত্তর দিয়েছিলেন সেদিন বাংলা সরকারের সেই হরিদাস পালটি? বলেছিলেন, 'দীনবন্ধু মিত্রকে দেখা করতে বলুন।'

`বুঝুন ঠেলা! প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে যিনি দেহরক্ষা করেছেন, সেই স্বনামধন্য লেখককে কিনা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে দেখা করার নির্দেশ!

কে এই হরিদাস পাল?

না. আপনার আমার মত কোন সাধারণ লোক নন, খাঁটি আই. সি. এস. অফিসার, রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে আমাদের সরকার যাদের ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল।

আর একটি ঘটনার কথা শুনুন। এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় পনেরো-বিশ বছর আগে।

শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন। বিরাট ব্যাপার। বিরাট আয়োজন। সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে অনেকেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানে।

সভাপতির আসন যিনি অলঙ্কৃত করেছেন, তিনি মহাশয় ব্যক্তি। সবাই তাঁকে এক ডাকে চেনে বাংলাদেশে। নাম বললে এখনো হয়তো অনেকে তাঁকে চিনতে পারবেন আশা করি।

অনুষ্ঠান শেষে শুরু হল তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। আহা, কি অমূল্য বাণী! কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ! কেন যে এমন লোককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডি. লিট্. দেওয়া হয়নি, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে।

শুধু একবার নয়—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার তিনি বললেন সেই একই কথা: 'সত্যিই খুব ভাল লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র। আমি

তাঁর "বৌঠাকুরাণীর হাট" বইটা পড়েছি। চমৎকার লিখেছেন তিনি।'

সত্যি, কি ভুল ধারণা নিয়েই না এতকাল ছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম, "বৌঠাকুরাণীর হাট" বুঝি রবীন্দ্রনাথের লেখা। কিন্তু সেদিনই প্রথম জানলাম যে—না, রবীন্দ্রনাথ নয়, আসলে "বৌঠাকুরাণীর হাট" শরৎচন্দ্রেরই আর একটি অমর সৃষ্টি।

কে এই স্নানতাপস মনীষী ?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ইনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একজন মাননীয় মন্ত্রী ছাড়া আর কেউ নন।

আজ্ঞে না, খাদ্য বা পশুপালন মন্ত্রী নন, শিক্ষামন্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০।

না, আর গ্যাস নয়।

মাই ওয়ার্ড ইজ অনার। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর কোনদিনও গ্যাস দেব না। দিলেও বেশি দেব না। স্লাইট।

লাভ কি দিয়ে। এখন কে কম যায় আমার চাইতে। বিশেষ করে আমাদের পার্টি দাদারা। কার সাধ্য এ ব্যাপারে তাদের সামনে খাপ খোলে! না মশাই, সবিনয়ে স্বীকার করছি যে, অত হিম্মৎ আপনাদের বহুরূপীর নেই।

অবশ্য ইচ্ছে করলে গ্যাস দিতে আমিও পারি। বেশ ভালই পারি। এমন গ্যাস দিতে পারি যে, শুনলে পরে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। কিন্তু পাঁচ বছরের বাচ্চারাও জানে যে, বহুরূপীর গ্যাস নিছক গ্যাসই। একমাত্র গ্যাস দেয়া ছাড়া তার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু দাদাদের গ্যাস ! আরে বাসরে। রক্ষে করুন, আমি ওসবের মধ্যে নেই। সত্যি বলতে কি, তেনাদের গ্যাসের মধ্যে যে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা আসলে গ্যাস, তা চট্‌ করে বুঝে ওঠা মুশকিল। তফাত এইখানেই।

তা বলে কি সত্যিই বোঝা যায় না ? যায়। খুব যায়। কারণ এ যুগে এ ব্যাপারে কেউ কারো চাইতে কম সেয়ানা নয়। তাই কায়দা করে যতই গ্যাস দিক না কেন, কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা গ্যাস, তা বুঝে নিতে মোটেই দেরি হয় না আজকের মানুষের।

ছু-একটা নমুনা দিচ্ছি শুনুন।

সপ্তাহখানেক আগেকার কথা। জ্যেঠামশাইয়ের শবদেহ নিয়ে গিয়েছিলাম শ্মশানে। হঠাৎ জনৈক দাদার প্রশ্ন : কি হয়েছিল মশাই ?

সবিনয়ে জবাব দিলাম, অ্যাকসিডেণ্ট।

অ্যাকসিডেণ্ট ! ব্যস, আব কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, নিশ্চয় আমাদের পার্টির মেম্বার। এ অত্যাচার কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। এর বদলা আমরা নেবই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

পিল পিল করে লোক ছুটে এল হাঁক শুনে। তাদের কণ্ঠেও সেই একই শপথ। এর বদলা আমরা নেবই। জান কবুল।

ততক্ষণে ছুটি চারটি করে অন্য পক্ষের দাদারাও এসে হাজির। কক্ষনো না। এ ডেডবডি আমাদের পার্টি মেম্বারের। নিজেরা অপকর্ম করে এখন উল্টো আমাদের ওপর ব্লেম দেয়া হচ্ছে। এসব চালাকি চলবে না। এর প্রতিকার চাই। বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।

বোঝাতে চেষ্টা করলাম ছু-পক্ষকে। আপনারা ভুল বুঝেছেন। দয়া করে ডেডবডিটা ছেড়ে দিন।

কক্ষনো না। গর্জে উঠলেন এক পক্ষের দাদা, আগে ব্লাড টেস্ট করে দেখা হবে যে, উনি কোন্ পার্টির মেম্বার, তারপর অন্যকথা। ততক্ষণ কিছুতেই ডেডবডি ছাড়া হবে না।

ছাড়া হবে না মানে! এবার গর্জে উঠল অপর পক্ষ, আব্দার নাকি! চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে উনি আমাদেব পার্টির মেম্বার, সুতরাং ডেডবডি থাকবে আমাদের আণ্ডারেই।

আর একবার বোঝাতে চেষ্টা করলাম দু-পক্ষকে। যা ভেবেছেন, সব ভুল। উনি কস্মিনকালেও কোন পার্টি মেম্বার ছিলেন না। আর কোন সংঘর্ষের ফলেও উনি মারা যাননি, মারা গিয়েছেন মোটর অ্যাকসিডেন্টের ফলে।

কে কার কথা শোনে! তবে বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপরই শোনা গেল দুমদাম বোমা ফাটার শব্দ।

ভয়ে ভয়ে ডেডবডি ফেলেই পালিয়ে এলাম। শেষ পর্যন্ত কোন্ পার্টি মেম্বার পরিচয়ে তার শবদাহ করা হয়েছিল, বা আদৌ করা হয়েছিল কিনা, নাকি দু-পক্ষই অর্ধেক করে ভাগাভাগি করে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল, সে তথ্য আমার অজ্ঞাত।

আপনারাই বলুন, এরপরেও আর কোনদিন আমার গ্যাস দেয়া সাজে কি! অসম্ভব! অত হিম্মৎ আমার নেই। সুতরাং আর গ্যাস নয়। দিলেও একটু রয়ে সয়ে। স্লাইট।

তাছাড়া ভয়ও আছে। এ যুগে সবাই চালাক। সবাই চালু। এ অবস্থায় ফর নাথিং গ্যাস দিতে গিয়ে কখন যে মালক্যাচ হয়ে যাবে, তা কে বলতে পারে। কি লাভ সেক্ষেত্রে শুধু শুধু নিজের প্রেস্টিজ পাংচার করে।

হাজার সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কিভাবে যে মালক্যাচ হয়ে যায় তার একটি গল্প শুনুন।

এ গল্প আমাদের ফিলিম লাইনের জনৈক শিল্পীর।

লোক হিসেবে ভদ্রলোক খুব একটা খারাপ নন। দোষ একটাই। গ্যাসটা একটু বেশি মাত্রায় দিয়ে থাকেন।

তা ফিলিম লাইনে এটা খুব একটা দোষের নয়। যে ব্যবসায়ের যে ধর্ম। গ্যাস না দিলে এ লাইনে বড় হওয়া যায় না, এ তো সবাই জানে।

যেমন—'আমি সেক্সপিয়র ভালবাসি', 'আমি নিজের হাতে রান্না করতে ভালবাসি' ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো আসলে কি! থাক, বললে ওরা আবার রেগে যাবেন। তার চাইতে সেই ভদ্রলোকের গল্পটাই শুনুন।

সেদিন সাতসকালেই জনৈক ধোপদুরস্ত ব্যক্তি শিল্পীটির বাড়ি গিয়ে হাজির। দেখেই বোঝা যায় যে, কোন জাঁদরেল প্রোডিউসার।

শিল্পীদের কারো সঙ্গে চট করে দেখা করতে নেই। তাহলে নাকি তাদের বক্স-অফিস কমে যায়।

বলা বাহুল্য যে, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। হাতে কোন কাজ নেই, তবু কিছুতেই শিল্পীটি বেরিয়ে এলেন না বাইরের ঘরে। বরং ভেতরে বসেই নিজের দাম বাড়ানোর জন্য দিব্যি তিনি গ্যাস ছাড়তে লাগলেন আগন্তুককে শুনিয়ে শুনিয়ে।

কি হবে আর নতুন ছবি নিয়ে। আমার ডেট কোথায়। হাতে সতেরোটা ছবি। এ বছরে সাড়ে চার লাখ টাকা তো অলরেডি পেয়েই গেছি। এত টাকা খাবে কে! আর নতুন ছবি হাতে নেবার আমার টাইম কোথায়।

ভাবটা এই যে, প্রোডিউসার বেটা বুঝুক যে, আমি কত বড় বিজি আর্টিস্ট। আমাকে পেতে হলে কম টাকায় হবে না।

এমনি করে প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপর নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন শিল্পীটি এবার বেরিয়ে এলেন আগন্তুকের সামনে। কি চাই আপনার বলুন? কোন্ প্রোডাকসন থেকে এসেছেন?

—আমি এসেছি ইনকামট্যাক্স অফিস থেকে। সাড়ে চার লাখ টাকার রিটার্ন এখনো পর্যন্ত দাখিল করেননি কেন বলুন?

এঁ্যা! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন শিল্পীটি। হায় ভগবান! গ্যাস দিতে গিয়ে যে এমন বিপদে পড়তে হবে তা কে জানত! নইলে একথা তো লাইনের সবাই জানে যে আপাতত তার হাতে কোন ছবিই নেই। এখন উপায়।

আর বলেন কেন! আজ বিষ্যুৎবারের বারবেলায় প্রকাশক মানিক বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বেশ একহাত হয়ে গেল।

কারণ! কারণ সেই পুরোনো ব্যাপার। অর্থাৎ, অ্যাজ এ হিরো কে বড়? দিলীপকুমার, না উত্তমকুমার? ওঁর মতে উত্তমকুমার বড়। সবাইকে কথাটা খোলাখুলিভাবে জানাতে উনি কোনরকম দ্বিধা করেননি।

বলা বাহুল্য যে, কথাটা আমার ভাল লাগেনি। এ কি অন্যায় কথা! আকবর বাদশাকা বেটা সেলিম জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কিনা কোথাকার কোন্ হেমদাকান্তর তুলনা! হিন্দুস্থানকা লীডার, আর বাংলাদেশের কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ের মহিম হল কিনা এক! চালাকি পায়া হ্যায়!

আশ্চর্য, লোকটা তবু তার গোঁ ছাড়তে নারাজ। বলে কিনা, উত্তমই বেস্ট।

আর সহ্য হল না দাদা। এতবড় কথা! ইম্‌পসিবল্! দিলীপ মেরা মহব্বতকা চাঁদ! দিলীপ মেরা কলিজাকা ফুল! দিলীপ মেরা গোস্ত্‌কা খুন, হির্‌দয়কা মেটেলি। দরকার হলে তার জন্য আমি

জান পর্যন্ত লড়িয়ে দিতে পারি। কাম অন্। ফাইট্। প্রমাণ হয়ে যাক কে বড়। দিলীপ, না উত্তম।

বলুন, ঠিক করছি কিনা? বলুন, দিলীপের সঙ্গে কারো তুলনা হয় কিনা? নেভার। দিলীপ ইজ দিলীপ। তার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। বিশেষ করে উত্তমকুমারের তো নয়ই। কারণ একজন রিয়েল হিরো, অন্যজন তার ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং তুলনার কোন প্রশ্নই আসে না।

প্রমাণ? প্রমাণ দিলীপকুমার-অভিনীত প্রতিটি ছবি। স্বলিখিত 'লীডার' ছবির কথাই ধরুন। ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দিলীপ ও তার মহব্বতকা রাণী বৈজয়ন্তী। হঠাৎ বিমান থেকে শুরু হল মেশিনগানের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। আশ্চর্য, দিব্বি অক্ষত দেহে দিলীপ তার নায়িকাকে নিয়ে সরে এল। একটা গুলিও তার গায়ে লাগল না। কি করে লাগবে! হিরো যে। গুলিগুলো পর্যন্ত জানে যে হিরোর গায়ে তাকে লাগতে নেই। এ কি চাট্টিখানি কথা!

পারবে উত্তমকুমার এতখানি বীরত্ব দেখাতে? অসম্ভব। মেশিনগানের গুলি দিলীপকে খাতির করলেও তাকে করবে না। ঠিক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে।

আরো প্রমাণ চান! প্রমাণ 'নয়া দৌড়'। সেখানেও দৌড়-প্রতিযোগিতায় দিলীপকুমারের ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ির কাছে নতুন কেনা যান্ত্রিক বাসগুলো দিব্বি হেরে গেল। হারতেই হবে। কোথায় খাপ্ খুলতে গিয়েছে দেখতে হবে না? এ তো আর উত্তমকুমার নয়।

এরপর ধরুন ডুয়েল ফাইট। এখানেও দিলীপকুমার এক ও অদ্বিতীয়। প্রমাণ অসংখ্য ছবি। একদিকে দলবল সহ ভিলেন, অন্যদিকে দিলীপকুমার একা। সে কি থ্রিল। সে কি একসাইটমেণ্ট! সে কি প্রচণ্ড ঘুষোঘুষির শব্দ! শুধু ডুমদাম।

তারপর? তারপর আবার কি। যতবড় শক্তিশালী ভিলেনই হোক না কেন, দিলীপ যে তাকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে, সে তো বলাই বাহুল্য।

পারবে এ জিনিস কোনদিন উত্তমকুমার দেখাতে? ও আর পারতে হবে না। ঐ দৈত্যসদৃশ ভিলেনের একখানা রদ্দা খেলে উত্তমকুমার তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে তার বিগ সাপোর্টার মানিক বিশ্বাসকেও আর চোখে-মুখে পথ দেখতে হবে না। কিন্তু দিলীপ-কুমার? ও নেভার। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হারাতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন।

সোর্ড-ফাইটিংয়েই কি দিলীপকুমার কম যায়! মোটেও না। প্রমাণ কোহিনূর। সেই একই ব্যাপার। একদিকে দিলীপ, অন্যদিকে একাধিক ভিলেন। সে কি মারাত্মক ফাইট! ফল কি হল? পারল কেউ দিলীপকে হারাতে? ও আর পারতে হবে না। কিন্তু হত যদি উত্তমকুমার! থাক, আর বলতে হবে না। ওসব জানা আছে।

এবার আসল ব্যাপার, অর্থাৎ মহব্বতের কথায় আসা যাক। বলা বাহুল্য যে, এখানেও দিলীপকুমার, যাকে বলে একেবারে টপ্‌মোস্ট হিরো। ছবিতে তাকে দেখামাত্র কোন্ হিরোইন না হোঁচট খেয়ে পড়ে! সে কি আকুলি-বিকুলি! সে কি ছটফটানি! সোজা কথায় যাকে বলে দেখামাত্র প্রেম, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা, অমনি পতন।

বলা বাহুল্য যে, এ-সব কেসে দিলীপকুমার শ্রীমতীর মূর্ছা ভাঙাতে খুব একটা দেরি করে না। কারণ, তারও দিল্ কি দরিয়ায় তখন মহব্বতের তুফান উঠেছে। ফলে, নায়িকা খুশি। প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটার খুশি, আর আমাদের খুশির তো কথাই নেই।

আর উত্তমকুমার? ধানাই-পানাই করতে করতেই তার অর্ধেক

ছবি কাবার। তার মধ্যে আবার কত ভাবনা, কত দ্বিধা, কত কুণ্ঠা, কত সমস্যা। অবশেষে যদিও বা একটু প্রেমে পড়ি-পড়ি অবস্থা হল তো তাও আবার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না গোছের।

বলুন দাদা, রাগ হয় না! এটা কি সিম্পলি আমাদের ঠকানো হল না? নইলে যা করবার খোলাখুলি করবি তো! আমরা কি টিকিট কেটে খেলা দেখিনি? পয়সা কি মাগ্‌না নাকি?

যাক, ছেড়ে দিন মহব্বতের কথা। আসুন এবার ট্র্যাজেডির ব্যাপারে। এ ব্যাপারে দিলীপকুমার যে আন্‌প্যারালাল, তা কে না জানে। দিলীপকুমার যখন বুক ভরে হাওয়া টেনে 'পূর্‌ণিমা, তু মেরে মহব্বতমে ধোঁকা দিয়া' বলে অবশেষে ফুঃ করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, তখন বুকের ভেতরটা কুর্‌কুর্‌ করে ওঠে নাকি? দেহের সমস্ত স্নায়ুশিরাগুলো পিল্‌ পিল্‌ করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নাকি? আহা, মহব্বতেব খেলায় লোকটা জিন্দগী ভোর শুধু ধোঁকা খেতে খেতেই গেল! বেচারা!

আর উত্তমকুমার! পারবে সে ট্র্যাজেডি-কিং দিলীপকুমারের মত অমন ফুঃ কবে লম্বা নিশ্বাস ছাড়তে? নেভার। এ-সব কেসে কায়দা করে সিগ্রেটের ধোঁয়ার রিং পাকানো ছাডা অ: কিছুই তার কবণীয় নেই।

এবার গানের প্রসঙ্গে আসা যাক। বলা বাহুল্য যে, এখানেও দিলীপকুমার যাকে বলে মাস্টার। ইচ্ছে করলে তিন মিনিটের একটা গানের মধ্য দিয়ে সে বম্বে, পুণা, আমেদাবাদ. উটকামণ্ড, মাইশোর গার্ডেন, কাশ্মীরের লেক, চাই কি গোটা কন্টিনেন্ট পর্যন্ত ট্যুর করে আসতে পারে।

পারবে এ জিনিস উত্তমকুমার কল্পনা করতে! স্রেফ মাথা ঘুরে পড়ে যাবে দাদা, স্রেফ মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তফাত এইখানেই।

তাহলে কে বড়? দিলীপ না উত্তমকুমার? না না, আমি কিছু

বলতে চাইনে। বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। যা বলবার আপনারাই বলুন।

তবে এ ব্যাপারে একা উত্তমকুমারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আসল দোষ হল আমাদের পরিচালকদের। ওরাই ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। নইলে ওর পক্ষেও এমনি ধারা রিয়েল হিরো হওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল না।

'লালপাথর' ছবির কথাই ধরুন। ইচ্ছা করলে কি উত্তমকুমারকে দিয়ে এ ছবি একেবারে ক্লাইম্যাক্সে তুলে দেয়া যেত না? খুব যেত। শেষের দিকে নির্মলকুমারের সঙ্গে একহাত লড়িয়ে দিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। নাটকও তাতে চড়চড় করে উঠে যেত। তা আর দিল কোথায়!

তবে যা গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। এখনো সময় আছে।

উত্তমকুমার কি করবেন জানি নে, তবে সুযোগ একবার হারালে তিনি আর যাই হোন না কেন, দিলীপকুমার কোনদিনও হতে পারবেন না—এ-কথা আমি, বহুরূপী, আজ ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখলাম।

গল্প ক্লাইমেক্সে উঠেছে। নায়িকার পিতা গুরুতর অসুস্থ। শিয়রে বসে নায়িকা তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করছে। সারা মুখে তার গভীর উৎকণ্ঠা। কখন কি হয় কে জানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চোখ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নায়িকা আর্তস্বরে লুটিয়ে পড়ল পিতার বুকে।

এবার উপরোক্ত দৃশ্যটার চিত্ররূপ দিতে হবে। উৎ...বারেই পুরোনো কায়দায় ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করা চলবে ...কে প্রোগ্রেসিভ আইডিয়া নিয়ে বেশ একটা নতুন কিছু করতে হবে।

বলুন কি করা যায়! পারলেন না তো বলতে! বেশ, আমিই বলছি। নায়িকা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যে করে হোক, বাঁচাতেই হবে। নইলে নির্বান্ধব পৃথিবীতে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে একটু আশ্রয়ের জন্য ?

সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট একটি সিম্বলিক্ সট্। দেখা গেল—একটি লোক ক্ষেত থেকে পটল তুলছে। আবার একটি সিম্বলিক্ সট্। এবার দেখা গেল রাশি রাশি সর্ষেফুল হাওয়ায় দুলছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধ পিতা পটল তুলল এবং নায়িকা চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল।

দেখলেন তো কেমন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। এ হল তথাকথিত প্রোগ্রেসিভ ব্যাপার, অর্থাৎ সহজ কথা সহজভাবে বলব না—বলব কায়দা করে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। পার তো বুঝে নাও, নয় তো বুড়ো আঙুল চোষো গে।

বস্তুত এটা হল প্রোগ্রেসিভ যুগ। এ ব্যাপারে কে কতখানি খেল দেখাতে পাবে, তা নিয়ে আজ প্রতিযোগিতারও অন্ত নেই। ফলে, গরু-ছাগল মশা-মাছিরাও আজ জাতে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে ছবির গল্প বা সাহিত্যের ধারাও আজ পালটে গেছে। সৎসাহিত্য বলে এতকাল যা জনসমাজে কৌলিন্য অর্জন করে এসেছে—আজ তা স্রেফ অপাংক্তেয়।

শরৎচন্দ্রের দেবদাসের কথাই ধরুন। এককালে দেবদাস পড়ে অনেক কেঁদেছি। নিজেকে দেবদাস কল্পনা করে পার্বতীর অনুসন্ধানও কম করিনি। মিথ্যে বলব না দাদা, পেয়েছিলাম। একটি দুটি নয়, একেবারে বাণ্ডিল বাণ্ডিল পার্বতীই পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রোগ্রেসিভ-ধর্মী বলে শেষ পর্যন্ত একটিও ধোপে টেকেনি।

যাক্, দেবদাসের কথাই বলছি। এককালে দেবদাস মনকে

বলতে ..ড়া দিয়ে থাকুক না কেন, এখনকার প্রোগ্রেসিভ যুগে তা
যা ..বারেই অচল। কারণ, দেবদাসের নায়ক বা নায়িকা কেউ
প্রোগ্রেসিভ নয়। হলে কাহিনীর কাঠামোটাই আগাগোড়া পালটে
যেত। কিছুটা স্যাম্পল্ দিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।

নাবালক বয়সেই দেবদাস ও পার্বতী পরস্পরকে ভালবেসেছিল। অতি উত্তম কথা। পাত্র হিসেবে দেবদাসের অন্য কোন কোয়ালি-ফিকেশন না থাকলেও তার বাবার টাকা ছিল, সুতরাং এমন শাঁসালো মক্কেলের প্রেমে শুধু পার্বতী কেন—অমন বহু খেঁদি-বুঁচিই লটকে পড়ত। সত্যি বলতে কি, তাদের অভিভাবকরাই এ বিষয়ে প্রচ্ছন্নভাবে তাদের উস্‌কে দিত। বলা বাহুল্য যে, দেবদাস কাউকেই হতাশ করত না—কারণ সে প্রোগ্রেসিভ।

যথাসময়ে পার্বতীর বাবা বিয়ের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু দেবদাসের বাবা রাজী হলেন না। দেবদাস নিরুপায় হয়ে পিতার সিদ্ধান্ত মেনে নিল।

অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব! দেবদাস প্রোগ্রেসিভ হলে কক্ষণো এতবড় অন্যায়কে মেনে নিত না। বুকটান করে সে ফাদারকে দশ কথা শুনিয়ে দিত। তাতেও যদি কাজ না হত, তবে সে-রাত্তিরেই সে পার্বতীকে নিয়ে কেটে পড়ত। বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে পার্বতীর অভিভাবকদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া যেত। দিন সাতেকের মত বম্বের হোটেল-চার্জটা তাঁরা সস্নেহেই কন্যার আঁচলে বেঁধে দিতেন।

তারপর যা হবার ঠিক তাই। অর্থাৎ, কয়েকদিন বাদেই ফিরে এসে পিতাকে টিপ করে একটা প্রণাম করে দেবদাস বলত, 'ওকে আমি রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছি।' পিতাঠাকুর 'তবে রে' বলে প্রথমটাতে একটা হুঙ্কার ছাড়তেন, কিন্তু স্ত্রীর চোখে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ুয়ার মত চুপ করে যেতেন। ব্যস, মামলা খতম।

বস্তুত, অ্যাজ এ হিরো, দেবদাস এই প্রোগ্রেসিভ যুগে একেবারেই ডিসকোয়ালিফায়েড্। পার্বতীর অন্যত্র বিয়ে হবে শুনেই সে তাকে বঁড়শীর ছিপ্ দিয়ে আঘাত করে বসলো।

ছিঃ ছিঃ! মেয়েদের গায়ে হাত দেবার মত এতখানি পশুত্ব একালের কোন প্রোগ্রেসিভ নায়ক যে কোনদিনই দেখাবে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। বরং প্রয়োজন হলে তারা দূর থেকে অ্যাসিড বাল্ব্ ছুঁড়ে পালিয়ে যাবে—প্রয়োজন হলে অজস্র বেনামী চিঠি পাঠাবে—প্রয়োজন হলে নায়িকার অবাধ্য বাপ-ভাইকে পথে-ঘাটে ধরে ঠেঙাবে—তবু মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে নারীত্বের অবমাননা করার মত নোংরামি তাদের সত্যিই নেই।

পরের দৃশ্য—কোর্ট। এসব ক্ষেত্রে অন্য দশটি প্রোগ্রেসিভ নায়িকা যা বলে, বলা বাহুল্য যে, পার্বতীও তাই বলত। অর্থাৎ, আসামীকে সে চেনে না, স্কুলে যাতায়াতের পথে রোজ তাকে লোকটা বিরক্ত করত। সে রাজী হয়নি বলেই লোকটা তার গায়ে অ্যাসিড বাল্ব্ ছুঁড়ে মেরেছে। ব্যস, আর যায় কোথায়! আদর্শ নারী বলে পথে-ঘাটে বাসে-ট্রামে সর্বত্র তার জয়জয়কার। তবে হ্যাঁ, দেবদাসের বাবা হাজার খানেক টাকা খসাতে রাজী হলে মামলাটা আপসে মিটে যেত।

এরপর চন্দ্রমুখীর প্রসঙ্গে আসা যাক্! চন্দ্রমুখী বাঈজী, সোজা কথায় নাচনেওয়ালী। শরৎ-সাহিত্যে নাচনেওয়ালীরা সতীত্ব ও নারীত্বের ব্যাপারে এত বেশি পাওয়ারফুল যে, ঘরের মা-মাসীরা পর্যন্ত তাদের সামনে থাপ খুলতে ভয় পায়।

তবে শরৎচন্দ্র দূরদর্শী ছিলেন। অন্তত আজকের প্রোগ্রেসিভ সমাজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দূরদর্শিতাকে হাজার বার প্রণাম না করে পারা যায় না। কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, সর্বত্রই আজ নাচনে-ওয়ালীদেরই প্রাধান্য।

বলা যায় না, হয়তো চন্দ্রমুখী বেঁচে থাকলে আজ একটা বড়রকম খেতাব পেয়ে যেত।

এ হেন চন্দ্রমুখী এত এত মক্কেল চরিয়ে শেষে কিনা দেবদাসকে দেখেই একেবারে লেটকী খেয়ে পড়ল। বোঝা গেল, চন্দ্রমুখী আর যাই হোক্ না কেন—প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডেড্ নয়। তা যদি হত, তবে এই চন্দ্রমুখী দুদিনেই দেবদাসকে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিত।

এ তো গেল চন্দ্রমুখীর কথা। এবার দেবদাসের কথা বলা যাক্! চন্দ্রমুখী তার দেহ-মন-ধন-দৌলত সব কিছু দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও দেবদাস জানালো, 'ছিঃ! আমাকে ছুঁয়ো না। আমি যে তোমাকে কত ঘৃণা করি!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনারাই বলুন যে, এর পরে দেবদাসকে একটা বুদ্ধু ছাড়া কিছু ভাবা যায় কি? নইলে প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডেড্ হিরো কখনো এমন মওকা ছাড়ে? মা দুর্গা বলে দিনকয়েক ঝুলে থেকে তারপর সুযোগ বুঝে একদিন বেশ কিছু হাতড়ে নিয়ে কেটে পড়া এমন কি শক্ত কাজ ছিল মশাই?

বরং পাবর্তীকে কিছুটা প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডেড্ বলা চলে। যেমন, বিয়ের পরে একসময়ে সে দেবদাসকে লক্ষ্য করে জানালো, 'আমাকে কিছু গয়না কিনে দাও না দেবদা!' হ্যাঁ, এই তো প্র্যাক্টিকাল কথা। ভাবটা এই যে, কায়দা করে আগের মত এখনো যদি কিছু ম্যানেজ করা যায় তো মন্দ কি!

আশ্চর্য, বোকা-সোকা দেবদাসও এই সর্বপ্রথম মুহূর্তের জন্য প্র্যাক্টিকাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই সে কাউন্টার প্রস্তাব আনলো, 'তুই আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারিস?'

পার্বতী বুদ্ধিমতী, তাই দেবদাসের প্রস্তাবে সে রাজী হল না। রাজী হবার কথাও অবশ্য নয়। কারণ বুড়ো হলেও মক্কেল হিসেবে দেবদাসের চেয়ে ভুবন মুখুজ্যে ঢের বেশি শাঁসালো।

ব্যস, এই পর্যন্তই! এরপরই পার্বতী যা শুরু করল, তাতে তাকে

নেহাত খেঁদি-বুঁচি ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। অর্থাৎ, দেবদা, আমার কত সাধ, কত কষ্ট, তুমি আমার ওখানে চলো, আমি তোমাকে সেবা-যত্ন করব।

যা বাবা! পুরোনো মক্কেলকে একেবারে সরাসরি স্বামীগৃহে আমন্ত্রণ! না দাদা, এর পরে আর নায়িকা হিসেবে পার্বতীকে কোনরকম পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। কোন্ পরিচয়ে সে দেবদাসকে স্বামীগৃহে আমন্ত্রণ জানায়! কিসের দাবিতে!

প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডেড্ হলে পার্বতী এতবড় ভুল কিছুতেই করতে পারত না। বরং এসব ক্ষেত্রে অন্য দশটি নায়িকা যা বলে, সে-ও তখন তাই বলত। অর্থাৎ, দেবদা, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমার চিঠিগুলো ফেরত দাও।

এবার দেবদাসের মওকা। ক্রমাগত ঠকে ঠকে ইতিমধ্যে সে দস্তুরমত লায়েক হয়ে উঠেছে। তাই পার্বতীর কথার জবাবে আলতো-ভাবে সে বলবে, ঠিক আছে, নিয়ে যা। তবে তার আগে তোর ব্যাগ থেকে কিছু ছাড় দিকি!

সেকি! পার্বতী অবাক, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও? বেশ, কত টাকা তোমার দরকাব বলো?

—দশ-বিশ-পঞ্চাশ—যা আছে দে।

—বেশ, নাও! তবে এত টাকা দিয়ে কি করবে জানতে পারি কি?

নির্বিকার চিত্তে দেবদাস জবাব দেবে, মাল খাবো।

ভাদ্র, ১৯৬০।

জাতীয় সঙ্গীতের সংজ্ঞা কি ?

প্রশ্নটা উঠেছিল জলপাইগুড়ি থেকে ভূটান যাওয়া-আসার পথে। তর্ক-বিতর্কও হয়েছিল বিস্তর। তবু শেষ পর্যন্ত এর কোন মীমাংসায় আসা যায়নি। প্রশ্নটা যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেছে।

এ ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭০ সালের ২৫শে জুলাই, শনিবার। যাত্রী-সংখ্যা ছ'জন। আমি, সুবীর আর অসিত। বাকি তিনজন মেয়ে। তপতী, শম্পা আর কৃষ্ণা। ওরা সবাই জলপাইগুড়ির পি. ডি. কলেজের ছাত্রী। সবাই সুগায়িকা।

অবশ্য আরো দু-একজনের যাবার কথা ছিল। একজন জামা-কাপড় পরে তৈরিও হয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হয়নি। উঁহু, কারণটা বলা চলবে না। বললে চিত্রা ঠিক রেগে যাবে। আক্কেল-দাঁতটা যে ঠিক সময় বুঝে বে-আক্কেলেপনা শুরু করেছে, একথা কি কাউকে বলা যায় ? অন্যজন প্রীতি মজুমদার। তারও যাওয়া হয়নি সেদিনকার সেই ভূটান অভিযানে।

মেয়েদের মধ্যে তপতী বয়েসে সিনিয়ার। স্বভাবতই একটু গার্জেন-গার্জেন ভাব। শম্পা বা কৃষ্ণার ওসব বালাই নেই। হাসি-খুশিতে ভরপুর প্রাণবন্ত মেয়ে। তার ওপর কলেজের পরীক্ষা শেষ। সুতরাং যাকে বলে একেবারে পাহাড়ী ঝর্ণা।

সেকি বৃষ্টি সেদিন সকাল থেকে! দেখে সবারই মুখ ভার। কত আশা যে, কলকাতা থেকে আগত বহুরূপীদাকে ওরা ভূটান দেখাবে, তা কিনা এই নাছোড়বান্দা বৃষ্টি! দূর ছাই! ভাল লাগে না বাপু!

কথায় কথায় মাথাধরাটা তপতীর একটা ম্যানিয়া বিশেষ। একটু কিছু হল কি ব্যস, অমনি মাথাধরা। তবে বেশিক্ষণ নয়। ব্যবস্থা

তৈরিই থাকে। মাত্র একটি স্যারিডন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই কোয়ায়েট ও. কে।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। সকাল দশটা বেজে গেছে, তবু বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। ব্যস, অমনি মাথাধরা। তাড়াতাড়ি একটা সারিডন খেয়ে নিয়ে পরক্ষণেই সে ফেটে পড়ল অসহ্য ক্ষোভে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি! এমন রাগ হচ্ছে যে কি বলব!

আশ্চর্য, ওর রাগের ভয়ে হোক, বা যে কারণেই হোক, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল—আকাশ ফর্সা। শ্রীমান তিলকের ব্যবস্থাপনায় ততক্ষণে জীপও রেডি। সুতরাং আর দেরি নয়। চলো এবার। কুইক্!

ঠিক হল—প্রথমেই যাব পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পলাশবাড়ি চা-বাগানে। কারণ, তপতী, শম্পা এবং কৃষ্ণার মতই বহুরূপীর আর একটি না-দেখা দিদিভাই—যূথিকা গাঙ্গুলী। ঐ একই কলেজ থেকে সে পাস করেছে কিছুদিন আগে। তার একান্ত দাবী—বহুরূপীদাকে একবার আসতেই হবে আমাদের বাগানে। সুতরাং চলো এবার পলাশবাড়িতে! তারপর ভূটান।

শহর ছাড়িয়ে ক্রমশ জীপটা এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে। সুবীর এবং অসিত—দুজনেই অভিজ্ঞ চালক। সুতরাং সবাই নিশ্চিন্ত।

প্রথমেই এল ময়নাগুড়ি। তারপর ধূপগুড়ি। ততক্ষণে শম্পা এবং কৃষ্ণা গুন্‌গুনিয়ে উঠেছে নিজের মনে। প্রথমে আস্তে আস্তে। তারপর গলা ছেড়েই—'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ…'

পথ চলার আনন্দে বাধা পড়ল মস্তবড় একটা ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে। আচমকা ব্রেক কষে অসিত বলল, জীপ থেকে নিচে নেমে আসুন বহুরূপীদা। দেখুন, তিস্তার কি ভয়ঙ্কর রূপ! গত বছর এই তিস্তা যে কি বিধ্বংসী মূর্তি ধরে গোটা জলপাইগুড়ি

শহরটাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল সে তো আপনিও জানেন। এই সেই সর্বনাশী তিস্তা। এখান থেকেই জলঢাকা প্রকল্পের শুরু।

জীপ থেকে নেমে নিচে তাকিয়েই মাথা ঘুরে উঠল গার্জেন-দি তপতীর। বাব্বাঃ! কি ভয়ঙ্কর স্রোত! সঙ্গে সঙ্গে টুক করে একটি সারিডন। ব্যস, সব ঠাণ্ডা।

বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হল না। ছুটে এল এক রাইফেলধারী সান্ত্রী। ব্রীজের উপর দাঁড়ানোর ওয়াডার নেহি সাব্।

—কেন, বোমার ভয়ে নাকি? ফুট কাটল কে একজন, তা বাপু তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা বোমা-পার্টির লোক নই।

পুলিশের আবির্ভাব দেখে ততক্ষণে আবার মাথা ধরে গেছে তপতীর। সুতরাং আর একটি সারিডন।

আবার জীপ এগিয়ে চলল বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সামনে গয়েরকাঁটা। ডানদিকে আসাম রোড। এই আসাম রোড ধরে অনেকটা পথ গেলে তবেই ভূটানের ফুলসিলিং শহর। কিন্তু আপাতত আমাদের লক্ষ্য পলাশবাড়ি। তাই যেতে হবে আমাদের সোজা-পথেই। ওখান থেকে ফিরে এসে তবেই আসাম রোড।

কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা-বিরতি ঘটল বানারহাটে গিয়ে। উদ্দেশ্য—সবাই মিলে চা-পান। মাত্র পনেরো-বিশ মিনিট। তার পরই আবার যাত্রা শুরু হল নতুন করে।

এই! এই! শিগ্‌গীর জীপ থামান। হঠাৎ আর্তকণ্ঠ শোনা গেল তপতীর। কি ব্যাপার! না, তেমন কিছু নয়। ওর স্টক ক্লিয়ার। সুতরাং কয়েকটা সারিডন চাই।

সারিডন কিনে নিয়ে আবার জীপ এগিয়ে চলল গন্তব্য পথে। জানা গেল—পলাশবাড়ি বাগানের দূরত্ব এখান থেকে খুব সামান্যই। মাত্র কয়েক মাইল। এল বলে!

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল মহিলা মহলে। শিগ্‌গীর

আয়নাটা বের কর। চিরুণীটা গেল কোথায়? এই যাঃ! ভুল করে চিরুণীটা ফেলে এসেছি।

কি সর্বনাশ! শুনেই মাথা ধরে গেল তপতীর। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গে একটি সারিডন। ভাগ্যিস পাঁচ নয়া পয়সা দামের একটা চিরুণী ছিল আমার পকেটে। ঘটনার গুরুত্ব লক্ষ্য করে এবার ওটাই এগিয়ে দিলাম ওদের দিকে। নাও, হল তো!

ভেবেছিলাম কোনরকমে দেখাটা সেরে নিয়েই আবার পাড়ি দেবো ভূটানের দিকে। কিন্তু সব বৃথা। কিছুতেই ছাড়া পাওয়া গেল না যূথিকা দিদিভাইয়ের হাত থেকে। ঘুরে-ফিরে তার সেই একই কথা। এই তো তোমাকে আমি প্রথম দেখলাম দাদাভাই। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে! সুতরাং এত সহজে ছাড়ছি নে তোমাকে।

ক'দিন বাদেই (৭ই আগস্ট) যূথিকা দিদিভাইয়ের বিয়ে। প্রাণ-ভরে তাকে আশীর্বাদ করে, প্রচুর মিষ্টি খেয়ে, অনেক বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলাম প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে। আর দেরি নয়। চলো ফিরে সেই গয়েরকাঁটা। সেখান থেকে আসাম রোড ধরে—ভূটান।

দুঃখ হল আর একটি না-দেখা মেয়ে মীরা [illegible]াসের কথা ভেবে। গতকাল পর্যন্তও যূথিকা, শম্পা, কৃষ্ণা, মীরা—সবাই ছিল আমার কাছে অপরিচিত। যা কিছু আলাপ-পরিচয়, সবই ছিল চিঠিপত্রের মাধ্যমে। একে একে সবার সঙ্গেই এবার দেখা হল, শুধু দেখা হল না মীরার সঙ্গে। কাছাকাছিই রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে থাকে। তবু সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না যোগাযোগের অভাবে।

ফেরার পথে বাধা পেলাম বান'হাটে এসে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে। দাবী ওদের খুবই যুক্তিসঙ্গত। আপনারা তো ওদিকেই যাচ্ছেন। আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে

চলুন না। এতটা পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করতে খুব কষ্ট হয় আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গেই দাবী মঞ্জুর। তবে বেশিদূর নয়। মাত্র মাইল কয়েক। তারপরই আবার ওরা এক সময়ে জীপ থেকে নেমে গেল দল বেঁধে।

গয়েরকাঁটা হয়ে আসাম রোড। তারপর ডিমডিমা চা-বাগান। এবার একটু থামতে হবে। কারণ, আর একটি দিদিভাই, কৃষ্ণা ও শম্পার বন্ধু—নমিতা। সেই একই কলেজের ছাত্রী। এবার পরীক্ষা দিয়েছে।

লক্ষ্মী মেয়ে, তাই দ্বিরুক্তি না করে মিনিট কয়েকের মধ্যেই নমিতা উঠে এল জীপ গাড়িতে। আমিও ভূটান যাব তোমাদের সঙ্গে। চলো এবার। ফলে যাত্রী-সংখ্যা এবার দাঁড়াল মোট সাতজন।

পরবর্তী লক্ষ্য—ভূটান। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও ভূটানের প্রতিরক্ষার কোন নিজস্ব ব্যবস্থা নেই। সে দায়িত্ব বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের। স্বভাবতই এ রাস্তায় মিলিটারী ট্রাকের আনাগোনা অত্যন্ত বেশি। এ অবস্থায় সাবধানে এগোন ছাড়া উপায় নেই।

ভেতরে অস্পষ্ট মেয়েলী গুঞ্জন। কি ব্যাপার কিছুই বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ কানে এল শম্পার অভিমান তরলকণ্ঠ, না রে ভাই, আমি খেলব না। তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গ।

এই যাঃ! আচমকা চেঁচিয়ে উঠল নমিতা, আমার ঘড়িটা হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে রাস্তায়।

কি সর্বনাশ! শুনেই এলিয়ে পড়ল তপতী। তারপরই একটি সারিডন।

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! সুবীর, অসিত এবং আমি তিনজনই নেমে এলাম জীপ থেকে। আশা খুবই কম। ঝড়ের মত ভারি মিলিটারী ট্রাক সব ছুটে চলেছে রাস্তা কাঁপিয়ে। এতক্ষণে ঐ ঘড়ি হয়তো

চেপ্টে গিয়েছে কোন ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে। কিন্তু না। অক্ষত অবস্থায়ই ঘড়িটা পাওয়া গেল রাস্তার একপাশে। তারপরই জীপে উঠে দে ছুট!

এল বীরপাড়া। তারপর একে একে এল মাদারিহাট আর হাসিমারা। আরও পরে আলিপুরদুয়ার, ভূটান রোড, দলসিংপাড়া, জয়গাঁও জংশন।

রাস্তা আর আগেকার মত প্রশস্ত নয়। বেশ সঙ্কীর্ণ। তার ওপর প্যাচপ্যাচে কাদা। স্বভাবতই গতি এখন কিছুটা মন্থর।

কেটে গেল আরো বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ একসময় বলে উঠল সুবীর, আমরা এসে গিয়েছি। সামনেই ভূটান গেট। ঐ দেখুন উঁচুতে ভূটানের বিখ্যাত গুম্ফা বৌদ্ধ মন্দির। ওখানেই আমরা যাব থিম্‌পু রোড ধরে।

সামনেই বিরাট ভূটান গেট। গেটের এপারে হিন্দুস্থান, ওপারে ভূটান। কাছেই দাঁড়িয়ে ভূটানের একাধিক সান্ত্রী।

অনুমতি নিয়ে এবার আমরা জীপসহ ঢুকে গেলাম ভূটানের সীমানার অভ্যন্তরে। সামনেই ছোট্ট শহর ফুলসিলিং। ফুলসিলিং বাঁয়ে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে সোজা জীপ এগিয়ে চলল সেই গুম্ফা মন্দিরের দিকে। বিকেল তখন প্রায় পাঁচ ।

সত্যিই অপূর্ব। যেমন চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, তেমনি মন্দিরে অবস্থিত তথাগতের বিরাট ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। অজ্ঞাতেই মাথাটা নুয়ে আসতে চায় বার বার। আর ফুলসিলিং! ফেলে-আসা ফুলসিলিং শহর তখন কোথায়! ঐ যে বহু নিচে দেখা যাচ্ছে নিপুণ শিল্পীর আঁকা ছোট্ট একটি ছবির মত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ফিরে এলাম ফুলসিলিংএ। হৈ-চৈ করে একপ্রস্থ চা খেয়ে নিয়ে তারপরই সবাই দল বেঁধে এগিয়ে গেলাম শহরের পেছনে অবস্থিত পার্বত্য নদী দেখার উদ্দেশ্যে।

সবার চোখের কোণেই তখন অজ্ঞাত-লোকের স্বপ্ন। পাথরের

পর পাথরে ধাক্কা খেয়ে এই উন্মত্ত জলরাশি কোথায় ছুটে চলেছে কে জানে! মেয়েদের নজর তখন অন্যদিকে। অজস্র রঙ-বেরঙের পাথরের নুড়ি ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। এমন সুযোগ কখনো হাত-ছাড়া করা যায়! সুতরাং যত পার তুলে নাও আঁচল ভর্তি করে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল পার্বত্যভূমিতে। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া। ওদিকে আকাশেরও মুখভার। সুতরাং আর দেরি নয়। অনেক দূরের পথ। এবার ফিরে চল আপন ঘরে।

আশঙ্কা অমূলক হল না। কিছুদূর আসতে না-আসতেই শুরু হল আকাশভাঙা বৃষ্টি। সেই সঙ্গে উন্মত্ত ঝড়। মনে হয় ঝড়ের বেগে জীপ বুঝি উল্টে যাবে।

সেই ঝড়-জল-বৃষ্টির মধ্যেই একসময়ে কলকল করে উঠল শম্পা, কৃষ্ণা আর নমিতার কণ্ঠ—'আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাত্রি'। একটার পর একটা। প্রায় গোটা পথটাই। শুধু গান আর গান!

জলের ঝাপটা লেগে ভিজে সব একাকার, তবু গানের যেন আর বিরাম নেই। সেই সঙ্গে সমবেত দাবী। শুধু আমরা গাইলেই চলবে না। সবাইকেই আজ গাইতে হবে আমাদের এই জলসানুষ্ঠানে। নইলে আমরা ছাড়ব না। প্রথমেই আপনার পালা বহুরূপীদা।

—কোই বাত নেহি। বুক চিতিয়ে জবাব দিলাম, তবে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। সুতরাং আমি গাইব একেবারে লাস্টে। আগে অন্য সবার হয়ে যাক।

তীব্র সন্ধানী আলো জ্বালিয়ে জীপ তখন এগিয়ে চলেছে অতি সতর্কভাবে। রাস্তায় জল জমে গেছে। জলে থৈ-থৈ করছে চারদিক। একটু অসতর্ক হলে কোথায় কোন্ চোরাখাদে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে, কে জানে।

টুক করে মুখে একটা সারিডন ফেলে দিয়ে এবার স্বন্ধে আর গার্জেন-দি তপতী—'শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে, আসে ঐ কী ম্বা নই। রয়ে'।

একে একে সবার গান শেষ। বাকি শুধু আমি। এবার আমার পালা। বললাম, বেশ, গাইছি! তবে তোমাদের ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার পোষাবে না। দেশ-সুদ্ধু সবাই জানে যে, বহুরূপীর সবচাইতে বড় জিনিস হল তার জাতীয়তাবোধ। তাই আমি বরং জাতীয় সঙ্গীত গাইছি।

—হু'চারটে! কৃষ্ণা অবাক, আমরা তো জাতীয় কথা চাপা 'জনগণমন অধিনায়ক',—এই একটা গানই শুধু জানি! —মহব্বত—

—আমিও জানি, কিন্তু মনে মনে সমর্থন করি নে, কি বাস্তব-বাস্তবধর্মী নয়।

—মানে! এবাব প্রশ্ন কবল শম্পা, কি বলতে চাইছে আপনি?

—বলতে চাইছি যে, আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতির সম্পর্ক কতটুকু! চলো জার্মানীতে। এমন একজন লোকও সেখানে তুমি খুঁজে পাবে না, যে লোক তাদের জাতীয় সঙ্গীত 'ডয়েট্‌স্‌ল্যাণ্ড উইবার আলেস' গানটি জানে না। চলো জাপানে। দেখবে ছোট-বড় প্রতিটি মানুষের মুখে তাদের জাতীয় সঙ্গীত— 'কিমি গ য়া ওয়া'। আর আমাদের দেশে। তোমরাই বলো যে, ভারতবর্ষের ক'জন লোক বলতে পারে যে, তাদের জাতীয় সঙ্গীত কি? প্রতি লাখে একজনও জানে কি? জানে কিছু-সংখ্যক সিনেই পাগল লোক। কিন্তু বিরাট এই ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যা তত্র ক'জন? াকার

—তাহলে, 'জনগণমন অধিনায়ক গানটিকে আপনি গা সরল বলে স্বীকার করেন না? এবার প্রশ্ন করল নমিতা। ত্ব পাঁচ-

—ন' রি নে। আনন্দমঠের সেই 'মা যাহা তাকে?

পর পাথরে ছিলেন' এবং 'মা যাহা হইবেন'—এই তিনটি ছবির কথা কে জানে। প্রথমটা পাস্ট টেন্‌স্, পরেরটা প্রেজেন্ট টেন্‌স্, পাথরেরটা ফিউচার টেন্‌স্। একদিন বন্দেমাতরম্ বা জনগণমন হাতের যথেষ্ট সমাদর ছিল, একথা ঠিক। কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার করতে হলে এটা মানতেই হবে যে, ওগুলি এখন পাস্ট টেন্‌স্। কারণ জাতীয় বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

ঠাণ্ডা—তাহলে আপনার মতে কোন্‌টা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নয়। অন্যে? এবারের প্রশ্নটা গার্জেন-দি তপতীর।

আশঙ্কা ন লাট-বেলাট থেকে শুরু করে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপপত্নী, হল আকাশভমা, মাসী, খুড়ি, ছোট, বড়, সবাই প্রাণ খুলে গেয়ে বেগে জীপ, গান নইলে আমাদের পুজো প্যাণ্ডেল পবিত্র হয় না; সেই ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবন অচল আমি সেই গানের শব্দাই বলছি। যথা—'রূপ তেরা মস্তানা', 'বাগোমে বাহার হ্যায়', 'শাওনকে মাহিনা পওয়ন করে শোর', 'মেরা নাম হ্যায় চামেলী' ইত্যাদি।

—তাই বুঝি! একটা চাপা হাসি খেলে গেল শম্পার চোখে-মুখে।

—হ্যাঁ, তাই। দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম, স্বীকার কর আর নাই কর, এই হল আজকের ভারতের মর্মবাণী। জনগণের এই মর্মবাণীকে উপেক্ষা করলে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা হবে। তবে বেশিদিন নয়। আজ যা প্রেজেন্ট টেন্‌স্, প্রাকৃতিক নিয়মে মাত্র তা পাস্ট টেন্‌স্ হতে বাধ্য। গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য সবার আবার এমন এক নতুন জাতীয় সঙ্গীতের প্রবর্তন করতে তা বাস্তবধর্মী বলে বিবেচিত হবে ভাবীকালের বংশধরদের সতর্কভাবে

একটু অসম্ভব তো! বাধা দিয়ে বলল কৃষ্ণা, সেই ভাবীকালের একটা কে জানে! তাই আপনি শোনান না আমাদের!

—বেশ, তাই শোনাচ্ছি !.   ন সম্বন্ধে আর

সামনেই গয়েরকাঁটা। জীপ থামিয়ে এক কাপ কড়া বাবা নই। গলায় ভাল করে শান দিয়ে নিয়ে শুরু করলাম ভাবীকালের সঙ্গীত।   বর

'মেরা দিল্ ফাট্ গিয়া—

মহব্বতকা বোমা ফাট্‌কে, মেরা দিল্ টুট্ গিয়া।

হায় মেরা দিল্ ফাট্‌কে থোড়া এধার গিয়া

থোড়া ওধার গিয়া, থোড়া কুত্তা খা লিয়া—'

সবটা আর শোনানো গেল না। তার আগেই সব কথা চাপা পড়ে গেল সমবেত হাসির শব্দে। কিন্তু কেন? দিল্—মহব্বত—বোমা,—সব কিছুই তো ছিল এই গানেব মধ্যে! এটা কি বাস্তব-ধর্মী নয়?

শারদীয়া, ১৯৭০।

বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। কামনা করি বছরের ক দিনগুলি আপনাদের ভালয় ভালয় কাটুক। আপনারা সুখে থাকুন। ভাল থাকুন।

ভাল যা থাকবেন, তা মা গঙ্গাই জানেন, তবু বিজয়ার পরে এসব গালভরা কথা বলতে হয়। তাই নিয়ম। আমিও সেই নিয়ম রক্ষাই করলাম। নইলে যা দিনকাল পড়েছে, তাতে একমাত্র চোর-ছ্যাঁচোড়, চোরাকারবারী আর ফোরটুয়ান্টি ছাড়া ভাল থাকার যো আছে নাকি কারো! বিশেষ করে আমার মত সোজা সরল ভালমানুষ হলে তো আর কথাই নেই। এই লুঠের রাজত্বে পাঁচ-ভূতের খাঁই মেটাতে গিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে না তাকে?

য়া দিনটির কথাই ধরুন। সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি। কানে এল সেই চিরপরিচিত মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর।

এমন মিনসের মুখে আগুন।'

ব্যস, সাত-সকালেই মুখে আগুন দেয়া হয়ে গেল। অবশ্য এখানেই শেষ নয়। সবে তো শুরু। এখনো সারাদিন তো পড়েই রয়েছে। এমনি আরো কতবার যে আমার মুখে আগুন দেয়া হবে, তার সঠিক হিসেব দিতে হলে অন্যে তো দূরের কথা, যমরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বয়ং চিত্রগুপ্তকেও বোধহয় হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

অপরাধ? অপরাধ মারাত্মক। ঘরে চাল বাড়ন্ত। রেশনের চাল একদিনেই হাওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং যেখান থেকে হোক, এই মুহূর্তেই চাল এনে দিতে হবে। নইলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না।

শুনুন কথা! এ কি ইংরেজ আমল যে, দোকানে গিয়ে চাইলেই অমনি বস্তা বস্তা চাল পেয়ে যাব? এখন চাল পেতে হলে চাল দেবার কায়দা-কানুন জানা থাকা চাই। উপরি আয়ের পথ খোলা থাকা চাই। আমার সে সব সুযোগ কোথায়?

তাছাড়া শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সংসার আমার ছোট নয়। সেদিক থেকে শ্রীমতী আমার সত্যিই বড় হিসেবী। তেইশ বছরে হিসেব মিলিয়ে তিনি আমাকে মোট তেইশটি বালবাচ্চা উপহার দিয়েছেন। কমও নয়, বেশিও নয়। গুণে গুণে ঠিক তেইশটি। তার মানে কম করে হলেও দুবেলায় অন্তত বারো কিলো চাল দরকার। আমি তো দূরের কথা, বাংলা দেশের ক'টা পরিবারের পক্ষে তা সম্ভব, বলুন?

—কেন, আমার বাবার ওখানে তো রোজই হয়। রায় দিলেন শ্রীমতী, এই তো সেদিন দেখে এলাম। সবাই সেখানে চার বেলা করে ভাত খায়।

ব্যস, সমস্যা মিটে গেল। তার বাপেরবাড়ির সবাই যখন

চার বেলা করে ভাত খায়, তখন বাংলা দেশে খাদ্যাভাব সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি তো আর তেনার বাবা নই। এ সমস্যা আমি এখন মেটাই কি করে?

তবু থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শুনেছি গড়িয়াহাট বাজারের গেট সংলগ্ন আলুওয়ালাদের কাছে জিনিসটা নাকি যত খুশি পাওয়া যায়। দেখাই যাক একবার চেষ্টা করে!

দেখাই সার হল, কেনা আর হল না। যেমন দাম, তেমনি মেজাজ। চার টাকা কিলো, নিতে হয় নিন, নয়তো কেটে পড়ুন।

কেটেই পড়লাম। চার টাকা কিলো, তার মানে দিনে আটচল্লিশ টাকা একমাত্র চালের পেছনেই। কাজ নেই আমার অমন চাল দিয়ে। এর চাইতে রেশনের আটা অনেক ভাল।

ব্যস, বাড়ি ফিরতে না-ফিরতেই তুমুল কাণ্ড। সেকি তর্জন-গর্জন! সেকি বাক্যবাণ! বলি মতলবটা কি শুনি! ছেলেপিলে-গুলোকে কি না খাইয়ে শুকিয়ে মারতে চাও নাকি?

—না না, তা কেন? ভয়ে ভয়ে বললাম, ঘরে আটা তো রয়েছে। ও তো সবাই খাচ্ছে এখন।

—মুখপোড়া মিনসের কথা শুনলে গা জ্বালা করে। বলে কিনা সবাই খাচ্ছে! ঐ শুকনো রুটি খাবার জন্য সবাই তো হাঁ-পিত্যেস করে বসে আছে কিনা!

—সে তো ঠিকই। সে তো ঠিকই। সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিলাম, সবাই খেতে যাবে কোন্ দুঃখে? তবে চাল বা ময়দা যখন পাওয়া যাচ্ছে না…

—মিথ্যে বললে জিব খসে পড়বে। মুখে পোকা পড়বে। পাওয়া না গেলে আমার বাবার ওখানে এত এত সব জিনিস আসছে কোথা থেকে? জলখাবারের জন্য রোজ দুবেলা ওখানে ফুলকো লুচি আর মাংসের কারীর ব্যবস্থা। এসব শুকনো রুটি কোনদিন তারা চোখেও দেখেনি।

কি জবাব দেব বলুন! মাস গেলে মাইনে পাই সর্বসাকুল্যে মাত্র আড়াইশো টাকা। উপরি বলতে কিছুই নেই। তবে ছিল। কম করে হলেও এদিক-সেদিক করে ফালতু দু'চারশো টাকা তো বটেই। এখন তাও বন্ধ। দিনকাল ভাল নয়। ভাল-মন্দ কিছু হলে পিঠ বাঁচানো মুশকিল। এ অবস্থায় যে যাই বলুক না কেন, মুখ বুজে থাকা ছাড়া আর উপায় কি!

কিন্তু তাই বা কতক্ষণ? মুখ বুজে থাকতে দিচ্ছে কে? সেই একই অপরাধ। একই অভিযোগ। এসব কাঁটাভর্তি ছোট মাছ মানুষে খেতে পারে? কেন, বাঁজারে কি ভাল মাছ নেই?

বলুন, আপনারাই বলুন! মাস গেলে ঐ তো মাত্র আড়াই-শোটি টাকা ভরসা। এ বাজারে, এই সম্বল নিয়ে আমি তো দূরের কথা, এর দ্বিগুণ, তিনগুণ যারা রোজগার করে, তাদের মধ্যেই বা ক'জন পারে বারো টাকা দরে পোনামাছ কিনে খেতে?

—কেন, আমার বাবার ওখানে তো রোজ আসে? সে কত মাছ! বেড়াল পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারে না।

শুনলেন! কথাটা শুনলেন একবার! আপনাদেরও ঘর-সংসার করে খেতে হয়। বলুন, এ বাজারে ক'দিন পেরেছেন একটু সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করতে? নিশ্চয় খুব একটা বেশি পারেননি। পারা সম্ভবও নয়। মুখ্যু মেয়েছেলে সেকথা বোঝে কই?

তবু মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তুমুল কাণ্ড বেধে গেল পুজোর কেনা নতুন জামা-কাপড়গুলো নিয়ে। সেকি নাক-সিটকানো বাক্যবাণ! নিশ্চয় ফুটপাথ থেকে কেনা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল, নইলে ভদ্রলোকের বাড়ির ঝি-চাকররাও এসব জিনিস পরে না।

বলুন, আপনারাই বলুন! মোটা সুদ কবুল করে, অফিস দ্বারোয়ানের কাছ থেকে সাড়ে তিনশো টাকা ধার নিয়ে জিনিসগুলো

কিনে নিয়ে এলাম, তা কিনা ফুটপাথের মাল হয়ে গেল! শুনলে রাগ হয় না? পিত্তি জ্বলে যায় না?

—হ্যাঁ, শাড়ি দেখে এলাম বাবার ওখানে। বৌদিদের জন্য কত শাড়িই না কিনেছেন! সব পিওর সিল্ক। আড়াইশো তিনশো টাকা করে এক একটার দাম। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আর সহ্য হল না মশাই। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তোমার বাপেরবাড়ির কথা আলাদা। তাদের লাখ লাখ টাকার জমিদারী আছে। আমার সে সম্বল কোথায়?

—মুখ নেড়ে আবার খোঁটা দেয়া হচ্ছে! তা যতই খোঁটা দেয়া হোক না কেন, আমার বাবা বা দাদাদের নখের যোগ্যতাও কারো নেই, তা যেন মনে থাকে।

—সে তো রাতদিনই মনে রাখছি। ভুলতে আর দিচ্ছ কোথায়?

—কি! কি বললে! সঙ্গে সঙ্গে নিজমূর্তি ধারণ করলেন শ্রীমতী, আমি রাতদিন কথা শোনাই! শোনাই তো বেশ করি। কেন শোনাবো না? আমার বাপেরবাড়ির সঙ্গে কার তুলনা!

দুত্তরি তোর বাপেরবাড়ির নিকুচি করেছে। রাতদিন খালি বাপেরবাড়ি আর বাপেরবাড়ি! সংসারে এক বাপের বাড়ি ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। কিন্তু সে-কথা বলার সাহস আমার কোথায়? বললেই তো অমনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে। তাই একটু ভয়ে ভয়েই বললাম, সত্যিই তুলনা হয় না। তবে তাদের বাড়তি আয় আছে, তারা যা খুশি তাই করতে পারে। সবার পক্ষে তো আর তা সম্ভব নয়?

ব্যস, হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ। মুখপোড়া মিনসের কথা শুনলে গা জ্বালা করে। ইচ্ছে করে মুখের মধ্যে একটা পোড়া কাঠ গুঁজে দিই। এমন পুরুষের ঘর করার চাইতে গঙ্গায় ডুবে মরাও ভাল ছিল।

—তা ছিল। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা যখন করোনি, তখন শুধু শুধু এখন আর ওজন্য দুঃখ করে লাভ কি? আমি স্বীকার করছি যে, তোমার বাপেরবাড়ি···

—ওরে আমার কে রে! কথায় বলে ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোসাঁই, তাই বেহায়ার মত মুখ নেড়ে আবার বাপের-বাড়ির খোঁটা দেয়া হচ্ছে! মুখে আগুন! মুখে আগুন! কি লাভ এমন মিনসের ঘর করে! এমন মিনসে থাকার চাইতে না-থাকাও ভাল। ঠিক আছে, আমিও মজাটা দেখাচ্ছি! এই আমি সবাইকে নিয়ে জন্মের মত বাবার ওখানে চলে যাচ্ছি। আর যদি কোনদিন এ বাড়িতে পা দিই তো আমার নাম পদির মা-ই নয়, এই আমি তিন সত্যি করে গেলাম!

যাকে বলে ভীষ্মের প্রতীজ্ঞা, তাই দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করে সত্য সত্যই তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন জন্মের মত। শূন্য বাড়িতে পড়ে রইলাম আমি একা। কেউ অবশিষ্ট রইল না ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখে আগুন দেবার জন্য।

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। কন্যা পদির মুখ থেকেই তার পরবর্তী অধ্যায়টুকু আমার শোনা। এবার সে কাহিনীই আপনাদের শোনাব।

বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার। কতক্ষণের পথই বা! কন্যাকে দেখেই সোহাগে গলে গেলেন শ্রীমতীর বৃদ্ধা মা।

—ওমা! তুই! আয় মা, আয়। তা খবর সব ভাল তো! জামাইয়ের শরীর কেমন আছে?

—আছে এক রকম। শ্রীমতী গম্ভীর, তারপর তোমরা কেমন আছ বল?

—আর থাকা! হতাশভাবে বললেন বৃদ্ধা, কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করছি আর কি! একে কি বেঁচে থাকা বলে? হ্যাঁ, খেয়ে-পরে সুখ ছিল ইংরেজ আমলে। আর এখন! এমন রাজত্বে

বাস করছি যে, আজ এটা নেই, কাল ওটা নেই, পরশু সেটা নেই লেগেই আছে। কি বলব তোকে, আজ দেড়মাসের মধ্যে ভাত যে কি জিনিস কোনদিন চোখেও দেখিনি। শুধু শুকনো আটা।

—কেন? শ্রীমতী অবাক।

—তাছাড়া উপায় কি! চাল কোথায়? রেশনে যা পাওয়া যায় তা ছেলেপিলেদের মুখে দেব, না নিজেরা খাব? তাই ওটুকু ওদের ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের কপালে এক নাগাড়ে শুধু আটা।

—কি জানি বাপু! শ্রীমতীর কথায় বিস্ময়ের সুর, আমরা তো কোনদিন ওসব আটা-টাটা চোখেও দেখিনি।

—সেকি! এবার বৃদ্ধার অবাক হবার পালা, তাহলে তোরা খাস কি?

—কেন, ভাত? শ্রীমতী নির্বিকার, আমাদের ওখানে চারবেলাই ভাত হয়।

—বলিস কি! এত চাল পাস কোথায়?

—সে-সব তোমার জামাই জানে। এই বস্তা ভর্তি সব চাল। আগে জানলে তোমাদের জন্য বরং কিছুটা চামরমণি নিয়ে আসা যেত। তাই বা কি করে সম্ভব? যা ধরপাকড় চলছে চারদিকে!

—শুনে বড় খুশি হলাম মা। যাক, তোরা তা'হলে ভালই আছিস। আমাদের শ্যামবাজারে তো কিছুই পাওয়া যায় না। না তরকারী, না মাছ···

—মাছ! যেন আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীমতী, মাছের অভাব কি? তোমার জামাই রোজ ইয়া বড় বড় সব পাকা রুই বাজার থেকে নিয়ে আসে। আমাদের তো খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেল। আর শুধু কি মাছ! সেই সঙ্গে মাংস, ডিম, এটা-ওটা তো বলতে গেলে লেগেই রয়েছে। এই যে বৌদি, পুজোয় কি কি শাড়ি কিনলে বল?

—আর শাড়ি! শুকনো মুখে ভ্রাতৃবধূ জবাব দিলেন, যা

দিনকাল পড়েছে! বেঁচে থাকাটাই এখন মস্ত বড় সমস্যা। তাই ছেলেপিলেদের কোনরকমে একটা করে কিনে দিয়ে ওখানেই এবার পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তা ভাই, তোমাদের সব কেনা-কাটা হয়ে গেছে?

—কবে! ঠোঁট উল্টে জবাব দিলেন শ্রীমতী, তাও কি একটা-দুটো! যাকে বলে শাড়ির পাহাড়। একজনের গুণে গুণে দশটা করে।

—বল কি! চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন ভ্রাতৃবধূ, এত শাড়ি!

—উপায় কি! দিব্যি নির্বিকার ভাব শ্রীমতীর, কত করে বললাম যে, ওগো, এই দুর্দিনে এভাবে টাকাগুলো নষ্ট করো না, তা কে কার কথা শোনে! কিছু বলতে গেলেই অমনি মুখ ভার। কি আর করা! বাধ্য হয়ে নিতেই হল।

—অনেক টাকা তাহলে খরচ হয়েছে বল?

—অনেক আর কোথায়? বারো-চোদ্দো হাজার টাকা হবে হয়তো। এই যে! সহসা মেয়েকে লক্ষ্য করে মুখিয়ে উঠলেন শ্রীমতী, কতবার বললাম যে, ওলো পদি, ভাল দেখে দু'চারটে শাড়ি সঙ্গে নিয়ে চল, মামীমারা দেখলে খুশি হবে, তা শুনলে কেউ আমার কথা! ওমা! এরি মধ্যেই রাত আটটা বেজে গেল? বিন্দি, ঘুঁটে, আন্না, পুঁচকী, ভণ্টে, গন্‌শা ওরা সব কোথায়? শিগ্‌গীর ডাক ওদের। ওদিকে যে বুড়ো মানুষটা একা বাড়িতে পড়ে রয়েছে, সেদিকে কি ধিঙ্গি মেয়ের একটুকু খেয়াল আছে?

কার্তিক, ১৯৬৭।

—হে-হে-হে-হে—যা বলেছেন স্যার!

মানেটা নিশ্চয়ই বোধগম্য হয়নি! কি করে হবে! মাথায় কিছু থাকলে তো! ঐ জন্যই তো আপনার কিছু হল না।

যাক্, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন আপনি একজন বিদগ্ধ মানুষ। ইচ্ছে ছিল দেশ ও দশের মাঝে একটা কেউকেটা ব্যক্তি হবেন—কিন্তু হতে পারেননি। পারেননি বলেই দুনিয়াসুদ্ধ সবার ওপর আপনার দারুণ রাগ। দারুণ বিতৃষ্ণা। আপনার ধারণা—সংসারে কেউ ভাল নয়। সবাই প্রবঞ্চক। সবাই স্বার্থপর। সবাই আপনাকে ঠকিয়েছে। নইলে মানুষ হিসেবে আপনি কারো চাইতে কিছু কমতি ছিলেন না।

অথচ কথাটা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। আসলে সংসারটা মোটেই নিষ্করুণ নয়। তাহলে এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনেও এত লোক তাদের বালবাচ্চা নিয়ে করে খেতে পারত না। আসলে দোষ আপনার। হ্যাঁ, স্রেফ আপনার দোষ।

কি আছে আপনার! কিসের জোরে আপনি মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান! প্রতিভা! যোগ্যতা! শিক্ষা! ভেবেছেন এই সম্বল নিয়ে বৈতরণী পার হবেন?

কচু করবেন। দেখলেন তো অ্যাদ্দিন চেষ্টা করে। হল কিছু! তবে! সুতরাং সত্যিই যদি কিছু করতে চান তো আপাতত ওসব শিকেয় তুলে রেখে মোক্ষম পথটি বেছে নিন। তারপর যদি কিছু না হয় তো তখন যা খুশি আমাকে বলবেন। আমি তাই মেনে নেব।

মোক্ষম পথটি কি?

কেন, ও তো আগেই বলে দিয়েছি! ঐ যে—হে-হে-হে-হে—যা বলেছেন স্যার!

দিনকাল পড়েছে। এই হে-হে-হে-হে-ই হল এ যুগের সাফল্যের ছেলেপিলের মন্ত্র। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি ঘরে, কি বাইরে পাট ও এই হে-হে-হে-হে ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কথা নেই। যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই শুধু শুনবেন এই—হে-হে-হে-হে…

কেন? কি এর কারণ? কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝে ফেলেছে যে, অন্য পথে বড় হতে গেলে তার সাকসেস্ সম্বন্ধে কোন গ্যারান্টি নেই। বর পদে পদে ল্যাং খাবার চান্স। কিন্তু এ পথে তেমন কোন আশঙ্কা নেই। জায়গা মত একটু হে-হে-হে-হে চালাতে পারলেই ব্যস। এমন সোজা পথ খোলা থাকতে কে আর সাধ করে অন্য পথে গিয়ে রিস্ক নিতে চায় বলুন!

তা বলে হাত বাড়ালেই মেওয়া পাওয়া যায় না। চাই ধৈর্য। চাই বৈষ্ণবোচিত বিনয়। আর চাই শিশুসুলভ বিগলিত হাসি। ব্যস, মূলধন হিসেবে ঐই ক'টি জিনিস থাকলেই হল। এবার জায়গামত একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারলেই একেবারে মার দিয়া কেল্লা!

এই আমার কথাই ধরুন। মিথ্যে বলবো না দাদা, আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে এখন মোটামুটি ভালই আছি। গায়ে গতরে একটু চর্বিও লেগেছে। ঘরের মেয়েমানুষটির কণ্ঠকেও যেন এখন আর তেমন দাঁড়কাকের গলা বলে ভুল হয় না। বরং মাঝে মাঝেই কেমন যেন একটু… যাক্‌গে সেসব কথা। তবে এই সবকিছুর মূলেই রয়েছে ঐ হে-হে-হে-হে। বিশ্বাস করুন, এতটুকুও বানিয়ে বলছি নে আমি।

এই তো সেদিনের কথা। খোদ ভাগ্যবিধাতার বাড়ির ড্রইংরুমে চুপচাপ বসে আছি। উদ্দেশ্য মহৎ। পারমিট একটি বাগাতেই হবে। কিন্তু কোথায় পারমিট? ক্ষেতের কলা, পুকুরের মাছের পালা সব ফিনিশ, কিন্তু কাজের বেলায় সব ঠন্ ঠন্।

তা বলে অধৈর্য হইনি। এসব ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়া মানেই সব

মাটি। সুতরাং কোনরকমেই হতাশ হলে চলবে না। চান্স আপনার ঠিক এসে যাবে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে ব্যস!

অধ্যবসায় কখনো বৃথা যায় না। এক্ষেত্রেও গেল না। হঠাৎ মহাপ্রভুর দেড় বছরের ছেলেটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে হাজির। যেমন কুৎসিৎ, তেমনি কদাকার। তদুপরি মুখ দিয়ে লালা ঝরছে অবিরাম। দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এই চান্স। যত খুশি লালা ঝরুক। যত খুশি জামা-কাপড় নষ্ট হোক। যত খুশি হেগে-মুতে একাকার করে দিক, তবু এ চান্স নষ্ট করলে চলবে না।

যে কথা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গেই ঝট করে উল্লুকটাকে বুকে তুলে নিয়ে হেসে বললাম, 'সত্যি, আপনার ছেলেটি কিন্তু ভারি লাভলী স্যার! দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।' এখানেই শেষ নয়। উল্লুকটার নাকে নাক ঘসে, মুখ দিয়ে উ-উ-বুঁ-বুঁ বিচিত্র সব আওয়াজ করে নিমেষে আমিও যেন একটা উল্লুক বনে গেলাম।

উল্লুক মহা খুশি। খুশি তার পিতৃদেবও। আর আমার কথা তো বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই কখন হারামজাদা ছেলে নাকটার ওপর ঘ্যাচ্ করে এক কামড় বসিয়ে দিয়েছে। জ্বালাও করছে বেশ। তবু মহাপ্রভু যে খুশি হয়েছে সেই ভেবেই আমি খুশি।

সেমি ফাইনাল থেকে ফাইনালে উঠে গেলাম। এবার চরম পর্ব। এগোতে হবে খুব হুঁশিয়ার হয়ে। একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে ঘাটে এসে ভরাডুবি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সামনের বুক সেল্ফ্টার দিকে তাকিয়ে টোপ ফেললাম, রবীন্দ্রনাথের নতুন বই কিনলেন বুঝি! বাঃ! ভারি সুন্দর বইগুলো তো! আপনার কিন্তু বেশ টেস্ট আছে।

—হ্যাঁ, কালই কিনে আনলাম। ঈষৎ খুশি হয়ে মহাপ্রভু মুখ খুললেন, খালি হুজুগ আর হুজুগ! কেউ কি আর পয়সা খরচ করে

দিনকা ন! আমি আবার ওসব লাইক করি নে। বই যখন পড়বো, কে ন কিনেই পড়বো।

—হে-হে-হে-হে তা যা বলেছেন ছ্যার! কিন্তু সেকথা বোঝে ক'জন? কথায় বলে গুণীর কদর গুণীই বোঝে। আপনার মত সবাই যদি এমন করে বুঝত, তাহলে তো কথাই ছিল না।

—সবার কথা ছেড়ে দিন, তবে আমাব তো ভাল লাগে। বেশ আনন্দ পাই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো পড়ে। যত পড়ছি ততই যেন ভাল লাগছে। এই নিয়ে কতবার যে পড়েছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্য, প্রতিবারই যেন নতুন করে ভাল লাগছে। এই তো কালও ওর একটা বই পড়লাম। কি যেন নাম! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। 'চরিত্রহীন'! অদ্ভুত বই!

—হে-হে-হে-হে তা যা বলেছেন ছ্যার! এমন বই এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে আর লিখবে? সত্যি চমৎকার! আমি তো পড়ে একেবারে ট্যারা হয়ে গেছি। অবশ্য ওব 'সপ্তপদী' বইটাও খুব খারাপ নয়।

—খারাপ আমিও বলছি নে, তবে চরিত্রহীনের মত ঠিক ততটা ইয়ে নয়। বরং সে তুলায় ওর 'কেরী সাহেবের মুন্সী'টা অনেক বেটার। বইটার মধ্যে বেশ একটা ইয়ে আছে।

—ঠিক মনের কথাটা বলেছেন ছ্যার। আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তা আপনি তো দেখছি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক স্টাডি করেছেন! আশ্চর্য, বাইবে থেকে বোঝাই যায় না।

—না না, এমন আর কি স্টাডি করেছি! ঈষৎ লজ্জা পেলেন মহাপ্রভু, ভাল লাগে, তাই সময় পেলে একটু নাড়াচাড়া করি আর কি! এই তো সেদিন ওর 'বেগম মেরী বিশ্বাস' বলে আর একটা বই কিনে নিয়ে এলাম।

—বলেন কি ছ্যার! ওটাও শেষ করে ফেলেছেন! যেমন ওজন,

তেমনি দাম। ও বই শেষ করা কি চাট্টিখানি কথা! নাঃ। আপনার ব্যাপারই আলাদা।

—শুধু ওটা কেন? মোমের মত গলতে লাগলেন মহাপ্রভু, ওর 'চৌরঙ্গী'টাও এরি মধ্যে পড়ে ফেলেছি। চমৎকার ডিটেকটিভ বই। বেশ সময় কাটানো যায়।

—ইস! ভাবাবেগে কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে অবশেষে বললাম, এ কক্ষণো হতে পারে না ছ্যার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতখানি স্টাডি করার পরেও আপনি এভাবে সবার অগোচরে আত্মগোপন করে থাকবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না। এর একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে।

—কি মুশকিল! খুশি হয়ে বিপন্নের ভান করলেন মহাপ্রভু, তা আমাকে কি করতে হবে বলুন?

—আপনাকে প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতেই হবে।

—দেখো দেখি কাণ্ড! এবার কাত হলেন মহাপ্রভু, এসব ব্যাপারে আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

—আমি কোন কথা শুনবো না ছ্যার। পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলেও বাইশে শ্রাবণটা এখনো হাতে রয়েছে। ব্যব:' যা করবার আমিই করব। আপনি মানা করলেও শুনবো না। ছোট ভাইয়ের এই আব্দারটা আপনাকে রাখতেই হবে।

ছোট ভাইয়ের আব্দার সত্যি তিনি রেখেছিলেন। পরদিনই তিনি পারমিটটা ইস্যু করে দিয়েছিলেন আমার নামে:

মানুষ স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্ন দেখতে চিরদিনই সে ভালবাসে।

অবশ্য তার কারণও আছে। স্বপ্ন অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। ফলে, দূর হয় নিকট। পর হয় আপন। তাছাড়া সান্ত্বনাও প' ওয়া যায় প্রচুর। বাস্তবে যার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, স্বপ্নে পাশের বাড়ির সেই টেপুরাণী যদি কিছুক্ষণের জন্যও এসে দগ্ধপ্রাণে একটু মলম লাগিয়ে যায়, সেকি চাট্টিখানি কথা! স্রেফ বিনি পয়সায় এতখানি সুবিধে আর কোথায় মিলবে বলুন!

বস্তুত, স্বপ্ন দেখার হাত থেকে সংসারে কারোরই বোধ করি মুক্তি নেই। সবাই স্বপ্ন দেখে। আপনারাও দেখেন। আমিও দেখি। এমনকি গতকালও দেখেছি। সে এক ভারি মজার স্বপ্ন!

দেখেছি আমি আর আমি নেই। আমার রূপান্তর ঘটেছে। কোন এক অদৃশ্য মহামন্ত্রে শ্রীবহুরূপীর পরিবর্তে রাতারাতি আমি একজন নামকরা চিত্র-নায়িকাতে পরিণত হয়ে গেছি।

ফলে, যা হবার ঠিক তাই। অর্থাৎ সারা হিন্দুস্থানে হৈ-চৈ। সবার মুখে আমার নাম, হাটে-মাঠে পথে-ঘাটে সর্বত্র আমার আলোচনা। ছেলে, ছেলের বাবা, বাবার বাবা—সবার মুখে একই উক্তি—হ্যাঁ, অ্যাদ্দিনে লাইনে একখানা মেয়ে এসেছে বটে! যেমন চালু, তেমনি কড়া। আর কি গ্ল্যামার মাইরি! শালা একেবারে চাবুক যেন!

হাসি পেল। নিজের পানে তাকিয়ে সত্যিই আমার হাসি পেল। নিজের একটু পাবলিসিটির জন্য এতদিন কাউকেই বোধ করি অয়েলিং করতে বাকি রাখিনি। কেউ আমার কথায় কান দেয়নি। অথচ এমন কি-ই বা আমি চেয়েছিলাম!

শুধু চেয়েছিলাম পত্রিকায় নিজের একটু জীবনী এবং সেই সঙ্গে

সস্ত্রীক—অর্থাৎ আমার, ও পদির মা-র একখানি ছবি। তাই আবার শেষের ইচ্ছেটা আমার নয়—স্বয়ং পদির মা-র। তবে তার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। এযুগে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে কারণে অকারণে দাঁত বের করে ছবি তোলা আভিজাত্যেরই একটা অঙ্গ। সবাইকে দেখে দেখে পদির মা-ও চেয়েছিল একটু জাতে উঠতে।

কিন্তু সব বৃথা! কত অনুরোধ, কত মিনতি—তবু পাত্তা দিলে না কেউ। বললে; আমাব নাকি গ্ল্যামার নেই। পঞ্চানন তো মুখের ওপরই বলে দিলে, বুড়ো হাবাতে আর কাকে বলে! যান যান—এ বয়সে এসব খেয়াল ছেড়ে দিদিমাকে নিয়ে মালা জপ করুন গে!

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেদিন মনে মনে বলেছিলাম, এত গরম ভাল নয় রে পঞ্চা—এত গরম ভাল নয়। বলা যায় না, একদিন হয়তো এই বুড়ো হাবাতের কাছেই আবার তোকে দৌড়তে হতে পারে। সিনেমার দৌলতে এযুগে হেঁজিপেঁজি কার না জীবনী ছাপা হচ্ছে! ওরই এক ফাঁকে আমার একটু জীবনী ও সেই সঙ্গে 'শাড়ি কিনতে চলেছে বহুরূপী ও পদির মা' বা 'ঠাকুর ভাসাতে চলেছে সস্ত্রীক বহুরূপী'—এমনি ক্যাপশন দিয়ে একখানা ছবি ছাপিয়ে দিলে এমন কিছু ক্ষতি হত না তোদেব। আচ্ছা, ভগবান যদি দিন দেয় তো সেদিন দেখা যাবে!

ভগবান সত্যিই দিন দিয়েছে। আজ কাগজে কাগজে আমার জীবনী। পাতায় পাতায় আমাব ছবি। দেয়ালে দেয়ালে, ক্যালেণ্ডারের পাতায়—সর্বত্র আমার বিচিত্র ভঙ্গিমার সব ছবি। এমন কি শহরের প্রত্যেকখানার ওপরে পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র আমারই ছবি। এককথায় বাঙালীর বর্তমান চিন্তাধারার মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আজ আব অন্য কারোরই কোনরকম স্থান নেই।

বলা বাহুল্য যে, পঞ্চাননের সেই গরম ভাবটা এখন আর নেই। এখন পত্রিকার অর্ধেক পাতাই জুড়ে রয়েছি—আমি। ভেতরে তো বটেই, এমনকি কভারে পর্যন্ত এখন আমার ছবি। সম্পাদকের কড়া হুকুম—গ্ল্যামার গার্ল মিস বহুরূপী ছাড়া আর কারো ছবিই আমি চাই নে। শুইয়ে, বসিয়ে, কাত করে, চিৎ করে, যত রকমভাবে সম্ভব—বহুরূপীর ছবি আমি চাই-ই চাই!

বিপদ হয়েছে পুরোনো সহকর্মীদের। কুশল, রামকৃষ্ণ, অশোক ঘোষাল কারো এতটুকু বিশ্রাম নেই। দিনের পর দিন একটানা ওরা লিখে চলেছে আমার জীবনী।

সহসা কুশলের লেখাটা নজরে পড়ল। পড়তে পড়তে এমন হাসি পেল! আমাকে কেন্দ্র করে সেকি ওর উচ্ছ্বাস! সেকি ওর ভাষা! যেন আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি আর কি!

লিখেছে, 'চুপচাপ বসে আছি! আমি আর গ্ল্যামার গার্ল মিস বহুরূপী। দুজনে। মুখোমুখি। নিভৃত নির্জন চারিধার। তাকিয়ে আছি। অনিমেষ নয়নে। ওর বেণীটার দিকে। আহা কি অপূর্ব! ঠিক যেন ঘোড়ার লেজটি ঝুলছে। তার চেয়েও মিষ্টি ওর হেলে-দুলে চলার ভঙ্গীটি। প্রতিটি পদক্ষেপেই ও যেন বলছে—এ বোঝা আর আমি বইতে পারছি নে গো। তোমরা আমাকে একটু তুলে ধরো'।

অজয় বিশ্বাসও কম যায় না। তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় সে লিখেছে, 'বহুরূপী। মিস বহুরূপী। ছোট্ট একমুঠো নাম। তা বলে প্রতিভার দিক দিয়ে ও ছোট নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। তাই নিঃসন্দেহে বলতে পারি—আজ বহুরূপী মানেই হিট্। বহুরূপী মানেই জিত। বহুরূপী মানেই নো ডিফেক্ট। বহুরূপী মানেই—ডিরেকটার টিট, প্রডিউসার চিৎ আর দর্শকরা ফিট'।

তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে আমাদের রামকৃষ্ণ রায়। অনুপ/সনী

দৃষ্টি দিয়ে ও নাকি আমার অনেক কিছু দেখেছে। অনেক কিছুই জেনেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের সব ক'টি উপমা তুলে দিয়ে ঠিক সেইভাবেই ও নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছে। লিখেছে, 'আহা মরি মরি! কি রঙ, কি ঠোঁট, কি চিবুক, কি গড়ন—সাধ্য কি, আমি এ অসামান্য রূপকে ভাষায় ব্যক্ত করি! টিকালো নাক, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, নির্ভেজাল বুক—কোনদিক থেকেই এতটুকু পিছিয়ে নেই ও। বলতে ইচ্ছে করে—হে অসামান্যা, হে তুলনা-হীনা, হে বহুবাঞ্ছিতা—সাধ জাগে তোমার ঐ সীমাহীন্ রূপসাগরে আমি চিরতরে হারিয়ে যাই। তলিয়ে যাই। ডুবে যাই। মরে যাই'।

পড়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। পথে এসো বাবা, পথে এসো। একদিন হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে পাত্তা দাওনি। আজ বোঝ ঠেলা!

সহসা সুবিনয় এসে হাজির। বলা বাহুল্য যে, এখন রোজই ওকে আসতে হয়। কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাতে নামাতে সুবিনয় বলল, প্লীজ্, শুয়ে পড়ুন ম্যাডাম। আমি চট্ করে ছবিটা তুলে নিই।

বুঝেও না বোঝার ভান করে বললাম, তার মানে?

—কাগজের জন্য আপনাব একটা ছবি নেব। নিচে ক্যাপশন দেব—'রাত বারোটায় নিদ্রামগ্না বহুরূপী দেবী'।

চিত্রতারকাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় জিনিস হল পাবলিসিটি। পাবলিসিটি মানেই পপুলারিটি। স্রেফ বিনি পয়সায় এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মানেই বোকামী। সুতরাং মুহূর্ত দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়লাম। শট হয়ে গেল।

আবার সুবিনয় বলল, এবার আপনাকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে ঠাকুরের সামনে বসতে হবে ম্যাডাম। এটার নাম হবে—'ভক্তিমতী বহুরূপী দেবী'।

বিব্রতভাবে বললাম, কিন্তু আমার বাড়িতে তো ওসব ঠাকুর-টাকুর কিছু নেই।

—সে আমি জানি। আপনার বাড়ি কেন, কারো বাড়িতেই থাকে না। তবে তার জন্য ভাবনা নেই। ছোটখাট একটি ঠাকুর আমি পকেটে করেই নিয়ে এসেছি। নিন, চোখ বুজে বসে পড়ুন!

কি আর করা! ঠাকুরের সামনে বেশ ভক্তিমতী হয়ে বসলাম। আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিতেও ভুললাম না। শত হলেও ভক্তিমতী সাজতে হবে তো!

একটা শেষ না হতেই আর একটা। আবার সুবিনয় আব্দার ধরল, ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় এবার আপনার একটা ছবি তুলব ম্যাডাম! সবাই দেখুক যে, রাইডিং করতেও আপনি কম ওস্তাদ নন। না না, ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে মই দিয়ে তুলে দেব। দাঁড়ান, আমি কোথাও থেকে একটা ঘোড়া ম্যানেজ করে আনছি।

সুবিনয় করিৎকর্মা ছেলে। মিনিট কয়েক বাদেই সে ফিরে এসে বলল, নিন, রেডি হয়ে নিন। উঁহু, শাড়ি চলবে না। কস্টিউম পরে নিন। ওতে গ্ল্যামার দেখাতে সুবিধে হবে। কিন্তু একটা কথা! ঘোড়া কোথাও পেলাম না। একটা গাধা পেয়েছি। ওটাই ধরে এনেছি।

ক্ষোভের সঙ্গে বললাম, সেকি! শেষে কিনা আমাকে গাধায় চাপতে হবে!

—কিছু ভাববেন না ম্যাডাম। এমনভাবে শট নেব যে, ওটা ঘোড়া না গাধা, কেউ তা বুঝতেই পারবে না। এর আগে এমন কতজনকে চাপিয়েছি। যাকগে, উঠে পড়ুন!

কি আর করা! সুবিনয়ের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত গাধাতেই চেপে বসলাম। হোক গাধা, তবু তো পাবলিসিটি! এ সুযোগ আর কোথায় পাব বলুন?

সুবিনয় বিদায় নেবার কিছুক্ষ.

শ্রীঅরূপ। পানের রসে রঞ্জিত দু'পাজ আমাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা হাসি হেসে তিনি বললেন, এই যে! হে-লন, 'আজ বাংলা যা ভাবে, কাছেই এলাম ম্যাডাম। শিগ্‌গীরই আমা.

এবার কিন্তু আপনাকে··· —সারা দেশ তাই

—চীফ গেস্ট হতে হবে, এই তো! হাসি —এযুগে প্রায় শুনে। শ্রীঅরূপই লাস্ট ফাংশনে হাজার তাগাদা দেও। খুকী, আমাকে কোন কার্ড দেয়নি। বলেছিল, না, আপনি কার্ড গছে— না। মেট্রো-ফাংশনে নিজের কার্ড আপনি আট টাকায় বেচে দিয়েছিলেন, সে খবর আমি রাখি। তাছাড়া গেস্টদের দেবার নাম করে বেশ কয়েক টিন সিগারেট গ্যাঁড়া মেরেছেন—সেকথাও আমার কানে এসেছে। সুতরাং কার্ড দূরের কথা—আপনাকে ফাংশনের ত্রি-সীমানায়ও ঢুকতে দেওয়া হবে না।

শুনে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল সেদিন। কি, এত বড় ব্লেম! তা, আমি যদি আমার হক্কের ধন বেচেই থাকি তাতে তোমার কি হে বাপু! বেচেছি, বেশ করেছি। আবার পেলে আবারও বেচবো। আর সিগারেট! ফাংশন বা পার্টিতে মওকা পেলে কোন্ বেটাই বা এ ব্যাপারে কম যায়, শুনি! আমি করলেই বুঝি যত দোষ!

অথচ সেই অরূপই এসেছে আজ আমাকে তোয়াজ করতে। এখন কি করা যায়! আচ্ছা করে দু' কথা শুনিয়ে ফিরিয়ে দেব লোকটাকে! কিন্তু না, হাজার হোক, পুরোনো সহকর্মী। বেচারা অনেক আশা নিয়েই আজ এসেছে। ফিরিয়ে দিলে ও হয়তো মনে খুব দুঃখ পাবে। তার চেয়ে এবারের মত ওর অনুরোধটাই বরং রাখা যাক। আমি গেলে যদি ওদের ফাংশনের সৌষ্ঠব বাড়ে তো বাড়ুক না! সত্যি বলতে গেলে, এ ব্যাপারে আমার স্বার্থটাও বড় একটা কম নয়।

.কান আপত্তি নেই। তবে ব্যাপার

বিব্রতভাবে বললাম, কি

টাকুর কিছু নেই। ।শল্পী ঘেঁটে ঘেঁটে শিল্পীদের মনের কথা

—সে আমি জ্বারি হয় না শ্রীঅরূপের। বাধা দিয়ে সঙ্গে

থাকে না। তুর্গেভাবে বলল, জানি। তা সেজন্য আপনাকে

আমি পকেটে। সুবিনয় তার ক্যামেরা নিয়ে সর্বক্ষণ আপনার

কি।ই থাকবে। আর মালাগুলোও আমরা স্পেশাল অর্ডার

আঁাতরি করিয়ে থাকি।

এর পরে আর না করাটা সত্যিই ভাল দেখায় না। সুতরাং কথা দিলাম, যাব।

সহসা দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তাই তো, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? আমাদের পঞ্চানন না?

তাই তো দেখছি! কি বাবা পঞ্চা, তুমি হঠাৎ এখানে কেন শুনি? বুড়ো হাবাতে বলে সেদিন তো আমাকে খুব ঠুকেছিলে! আজ চেয়ে দেখো আমার কত গ্ল্যামার। এমন গ্ল্যামার জীবনে আর কোথাও দেখেছ কি? নাও, ভাল করে চেয়ে দেখো!

কে যেন একপোঁচ কালি মাখিয়ে দিল পঞ্চাননের মুখে। বেচারা বলি বলি করেও কিছুই বলে উঠতে পারল না।

বড্ড মায়া হল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। হেসে বললাম, না না, আমি তার জন্য মনে কিছু করিনি। তবে তুমি আমার পাবলিসিটি না দিলেও আমি তোমাকে সে চান্স দেব। সুবিনয়কে বলো যে, আমি তোমার সঙ্গে একটা ছবি তুলব। ওটা ছাপা হলেই—ব্যস! দেখবে, রাতারাতি তোমার কতখানি মার্কেট ভ্যালু বেড়ে গেছে!

বস্তুত, আজ শুধু পঞ্চাননই নয়, এমনি কাড়াকাড়ি আমাকে নিয়ে চলেছে সবত্র। কোথায় আমি নেই? ছবির নায়িকারূপে— আমি। আমি না থাকলে দর্শকরা সে ছবি নেয় না। ক্রিকেট

খেলোয়াড়রূপে—আমি। ব্যাট ধরাে জ আমাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা
উল্লাস! গানের জলসায়—আমি। এযু মন, 'আজ বাংলা যা ভাবে,
না, চায় আমাকে দেখতে। নাচের আসরে-
নাচের জন্যও তত ভিড় হয় না, অথচ আমি ব্যাঙ- —সারা দেশ তাই
তার জন্য ভিড়ের চাপে হল ভেঙে পড়ে। এমনকি —এযুগে প্রায়
পর্যন্ত—আমি। । খুকী,

এযুগে ওদের নীরস বক্তৃতা আর কেউ শুনতে চায় না, তাই হচ্ছে—
জমানোর জন্য ডাক পড়ে আমার। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছ য়,
তোলাব জন্য বেচারাদের কি·উৎসাহ! কি হ্যাংলামি!

বেরুবাড়ি থানা কাদের দখলে গেল, টুকেরগ্রাম কে ছিনিয়ে নিল, কাদের চক্রান্তে খাদ্যমূল্য দিন দিন আগুন হয়ে উঠল—এ নিয়ে আজ আর ওদের মাথাব্যথা নেই, যত মাথাব্যথা আমাকে নিয়ে। সবাই চায় আমাকে খুশি কবতে। সবাই চায় আমাকে তোয়াজ করতে। দু' একজন তো আগামী নির্বাচনে আমার সমর্থন লাভের জন্য এরই মধ্যে হত্যে দিতে শুরু করেছে।

কাণ্ড দেখে আমি শুধু হাসি। কি ছিলাম, আর কি হয়েছি! ছিলাম সবার অবাঞ্ছিত বুড়ো হাবাতে, আর এখন কিনা আমি বহুজন-বাঞ্ছিতা গ্ল্যামার গার্ল মিস বহুরূপী! আমাকে ছাড়া আজ কি সমাজ, কি রাষ্ট্র—সবকিছু অচল। এক কথায় আমিই আজ তেত্রিশ কোটি মানুষের ধ্যান, জ্ঞান, জপমন্ত্র।

বস্তুত, আমার মত এতখানি জনপ্রিয়তা এযুগে আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। ঘরে-বাইরে—সর্বত্র আমি। সবাই আমার ফ্যান। সবাই চায় আমাকে। তিন পুরুষের নাম বলতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেলেও আমার ঠিকুজি-কোষ্ঠির খবর সবার কণ্ঠস্থ। পথে-ঘাটে দৈবাৎ কখনো আমার দেখা পেলে সেকি তাদের উল্লাসধ্বনি! সেকি উৎকট সিটি! সেকি রসালো খিস্তি! দেখে বুকটা আমার গর্বে ভরে ওঠে।

বিব্রতভাবে বললাম, কি[illegible]লারিটি। নইলে এত লোক থাকতে টাকুর কিছু নেই। [illegible]এমন মুখরোচক আলোচনায় মেতে উঠবে
—সে আমি জা[illegible]তো।
থাকে না। ত[illegible]তে, ইতিপূর্বে আমার মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আমি পকেটে[illegible]ানদিনও আসেনি। শুনে আমি মুখ লুকিয়ে হাসি।

কি[illegible] কচু! বাংলাদেশে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কম নেই, আ[illegible]'জন আমার মত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে?

[illegible] আসল জিনিস হল গ্ল্যামার। আমার গ্ল্যামার আছে এবং আইন বাঁচিয়ে কি করে, কত রকম কায়দায় গ্ল্যামার দেখাতে হয়, আমি তা জানি। এযুগে গ্ল্যামার মানেই প্রতিভা। গ্ল্যামার মানেই অর্থ-যশ-মান—সবকিছু। সোজা কথায় একালে—সবার উপরে গ্ল্যামার সত্য, তাহার উপরে নাই। নইলে যেখানে বাংলা-দেশের টেক্‌নিসিয়ানরা গড়ে মাসে একশো টাকাও পায় না—সেখানে প্রডিউসারের দল লাখটাকা নিয়ে আমার পেছনে ফেউএর মত ঘোরে কেন?

আরো প্রমাণ চাই? বেশ, তাও দিচ্ছি। আমার পাশের বাড়িতে কল্যাণী নামে একটি মেয়ে আছে। গত এম.এ. পরীক্ষায় মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

কিন্তু কই, বাংলা দেশের ক'জন লোক তার নাম জানে? ক'টা কাগজে তার জীবনী ছাপা হয়েছে? বিদেশে অনুষ্ঠিত ক'টা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিবেশনে সে এদেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে?

অথচ আমি ঘুরে এসেছি মোট চারবার। জীবনী ছাপা হয়েছে মোট সাড়ে তিনশো বার। আর ছবির তো কথাই নেই। কারণ, আমার গ্ল্যামার আছে এবং কি করে তাকে লোকসমক্ষে তুলে ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হয়, তা আমি জানি। সুতরাং যদ্দিন আমার এই গ্ল্যামার আছে, তদ্দিন আমাকে আর ঠেকায় কে?

বস্তুত, জনপ্রিয়তার দিক থেকে আজ আমাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। একদিন মহামতি গোখেল বলেছিলেন, 'আজ বাংলা যা ভাবে, কাল সারা হিন্দুস্থান তা ভাবে।'

সে যুগ গত হয়েছে। এখন আমি যা ভাবি—সারা দেশ তাই ভাবে। আমি যা করি, সবাই তাই করে। প্রমাণ—এযুগে প্রায় সবাই আমার মত করে গ্ল্যামার দেখাতে শুরু করেছে। খুকী, রামখুকী, বৃদ্ধা, প্রৌঢা—কেউ পিছিয়ে নেই। সবাই বলছে—'আমাকে দেখ্, আমাকে দেখ্'। দেখে বোঝা দায় যে, কে মেয়ে, আর কে মেয়ের মা। গান্ধীজী শ্রেণীভেদ দূর করতে চেয়েও পারেননি। অন্তত এই একটি ব্যাপারে আমি শ্রেণীভেদ দূর করতে পেরেছি। এ কৃতিত্ব পুরোপুরি আমার।

মজা হয় রোববার। স্যুটিং বন্ধ বলে সেদিন আমার বাড়িতে মেলা বসে যায়। আসে ডিরেক্টরের দল। আসে প্রডিউসারের দল। আসে ডিস্ট্রিবিউটারের দল। সবারই উদ্দেশ্য এক। সবাই চায় আমার লেজ ধরে বৈতরণী পার হতে।

খোলাখুলি জবাব না দিয়ে আমি শুধু ওজন কবে হাসি। অর্থাৎ—ফেলো কড়ি, মাখো তেল। কাগজওয়ালারা আর্ট-ফার্ট বলে যতই চেঁচাক না কেন, টাকার ব্যাপারে এযুগের কোন হিরোইনই কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। আমিও বলব না। মওকা যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ব কেন ?

সবাই চলে যাবার পরে আমি ক্লান্তিতে সোফায় গা এলিয়ে দিই। ঘরে ঢুকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস জোসেফাইন জানায়, আজকের ডাকে ফ্যানদের তরফ থেকে মোট সাড়ে তিন মণ চিঠি এসেছে ম্যাডাম। সবাই লিখেছে···

—আমাকে না পেলে আত্মহত্যে করবে, এই তো। ঠিক আছে। চিঠিগুলো পুরোনো কাগজওয়ালার কাছে সের দরে বেচে দাও।

—একজন বড় মার্চেন্ট তার আবিষ্কৃত ড্যাডোলীনের জন্য আপনার

সার্টিফিকেট চায়। পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক্ পাঠিয়ে দিয়েছে।

—চেক্‌টা জেনুইন কিনা জেনে নিয়েছ ?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। ব্যাঙ্কে ফোন করে জেনেছি।

—ঠিক আছে। লিখে দাও, আমি ড্যাডোলীন খেতে খুব ভালবাসি।

—না না, আপনার ভুল হয়েছে। ওটা খাবার জিনিস নয়, দাদের মলম।

—ঠিক আছে। লিখে দাও, ড্যাডোলীন ব্যবহারে আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি। যাক্, এবার তুমি যাও। সারাদিন বক্‌বক্ করে এমন মাথা ধরেছে কি বলব!

জোসেফাইন শুধু আমার সেক্রেটারিই নয়, লীগাল অ্যাড্‌ভাইজারও বটে। কি ভেবে সে বলল, কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমার মনে হয় আপনার বিয়ে করা উচিত।

—বিয়ে! বলছ কি তুমি!

—হ্যাঁ ম্যাডাম। পপুলারিটির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও যে দরকার।

—তুমি ঠিকই বলেছ জোসেফাইন। কথাটা অ্যাদ্দিন আমার মনেই হয়নি। সত্যিই আমার বিয়ে করা দরকার। হ্যাঁ, আমি বিয়ে করব। নিশ্চয়ই করব।

এ্যাই! এ্যাই! আঃ! আচমকা প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে স্বপ্ন ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, সামনেই রক্তচক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে আমার পদির মা।

মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই তার খন্‌খনে গলা প্রবল হয়ে উঠল, এই ব্যাপার! তাই ভাবি যে, ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছিনে কেন? তেইশটা ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে বুড়ো বয়সে কিনা আবার বিয়ে করবার মতলব!

আমতা আমতা করে বললাম, না, না গিন্নি। ব্যাপারটা হল গিয়ে···

—ব্যাপার কি আর আমার বুঝতে বাকি আছে? তেইশ বছর ঘর করেছি, আমি আর লোক চিনিনে? দাঁড়া ।·. এ বিয়ে করার সাধ আমি বের করছি। ঝেঁটিয়ে যদি মুখ ৻ দিই তো···

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে মারলাম সোজা দৌড়। এক দৌড়ে একেবারে অফিস।

তারপর! তারপর আর কিছু নেই। সেই থেকে আমি বাড়ি-ছাড়া।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯।

বিশ্বাস করুন, গুল দিচ্ছিনে। দুচোখ ছুঁয়ে বলছি।

অবশ্য ইচ্ছা করলে গুল আমি দিতে পারি। তবে দেব না। বিশেষ করে বিজয়ার পরে তো নয়ই। সুতরাং আদালতের সাক্ষীদের ভাষায় হলপ করে বলছি যে, যাহা কহিব, সত্য কথা কহিব। কদাচ মিথ্যা কথা কহিব না। কোন কথা গোপন করিব না।

কথাটা নিজের সম্বন্ধেই। প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার আজ একই জিজ্ঞাসা যে, কে এই ছদ্মদেশী বহুরূপী? কি তার নাম? নিশ্চয় বীরেন ভদ্র। নয়তো তৃপ্তি মিত্র। আর নয়তো শিবরাম চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর, মিসেস সিন্‌হা বা নারায়ণ গাঙ্গুলী। মোট কথা, এদের মধ্যে কেউ একজন না হয়ে যায় না।

ভুল। ভুল। ভুল। আজ ঠেলায় পড়ে স্বীকার করছি যে,

আমি চুনী গোস্বামী। মোহনবাগানের চুনী গোস্বামী। বাংলা ও বাঙালীর স্নেহধন্য চনী গোস্বামী।

কি বললেন /বিশ্বাস হল না? তা, আমার নিজেরই কি খুব 'কটা বিশ্বা' ়় ভেবেছেন? কিন্তু উপায় কি। অস্বীকার করলে ।দিকে দেখিয়ে দেবে না।

় লেই বলছি। মাত্র মাসখানেক আগেকার কথা। হঠাৎ ক বড়পিসিমার চিঠি এসে হাজির। অনেকদিন তোকে দেখি না। এবার খুব আম হয়েছে বাগানে। সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে একবার আয় না এখানে।

কি বলব দাদা, সঙ্গে সঙ্গে লালা ঝরতে লাগল মুখ গড়িয়ে। ফোকটে আম খেতে পেলে সপ্তাহখানেক কেন, সারাবছর ওখানে কাটাতে হলেও আমার কোন আপত্তি নেই।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে পরদিনই রওনা দিলাম পিসিমার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

মিথ্যে বলব না দাদা। পিসিমার আদর-যত্নে দিন সাতেকের মধ্যেই যেন একটু চেকনাই ফিরে এল গায়ে-গতরে। হবে নাই বা কেন? কাজের মধ্যে তো একমাত্র মেলব্যাগ ও দপ্তর লেখা, আর সাধ মিটিয়ে ভাল-মন্দ খাওয়া। অমন মওকা পেলে কার না গায়ে-গতরে হাওয়া লাগে, বলুন?

অবশ্য পোস্ট-অফিসটা একটু দূরে। তা সেদিক থেকেও অসুবিধের কোন প্রশ্ন নেই। পাশের বাড়ির হাবলাকে এরি মধ্যেই ম্যানেজ করে নিয়েছি গুলগাল মেরে। ফলে, পোস্ট-অফিসে চিঠিপত্র দেয়া-নেয়ার কাজটা তার ওপর দিয়েই দিব্যি চলে যায়।

হঠাৎ সেদিন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল হাবলার। কি ভেবে সে প্রশ্ন করল, আপনি কোন্ বহুরূপী বড়দা? সিনেমা জগতের বহুরূপী কি?

—হ্যাঁ, তাই। সম্মতি জানিয়ে বললাম, কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

কে জবাব দেবে? কোথায় হ্যাবলা? সঙ্গে সঙ্গে সে হাওয়া।
তবে বেশিক্ষণ নয়। আবাব সে ফিরে এল মিনিট কয়েক বাদেই।
সঙ্গে একপাল আণ্ডাবাচ্চা। সবার চোখে-মুখে অনন্ত বিস্ময়। যাকে
আবিষ্কাব কবাব জন্য পাঠক-পাঠিকাদের এই নিরলস গবেষণা, সেই
বহুরূপী যে জলজ্যান্ত তাদেব গাঁয়েই বয়েছে, একথা বুঝি তাদের
স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

—কি চাও তোমরা? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম সবার দিকে।

—না না, কিছু না। হে-হে-হে, আপনার লেখা···সেই যে
সেবাব··খিক্ খিক্ খিক্···মাইরী, কি ভড়কীই না দিয়েছিলেন
সেবার!

—মুখ সামলে কথা বলিস ভল্টে। সতর্ক করে দিল কে একজন,
শেষে এ্যায়সান ঠুকে ঠুকে লিখবে যে, মজাটা টের পাবি।

—আপনি নিশ্চয়ই একজন বড় খেলোয়াড়?

—খেলোয়াড়! আমি অবাক। আমি আবার খেলোয়াড় হতে
গেলাম কবে?

—নিশ্চয় খেলোয়াড়। দৃঢ়স্বরে বলল খোকাটি, খেলোয়াড় নইলে
'মোহনবাগানের মেয়ে' লিখলেন কি করে? অত হিস্ট্রি তো আর
কারো জানবার কথা নয়? আপনি কোন্ টীমের প্লেয়ার বলুন না
বড়দা?

আমি তাজ্জব। বলে কি! কি করে ওদের বোঝাব যে, খেলা
তো দূরের কথা, জন্মেও আমি কোনদিন মাঠ-মুখো হইনি।

ঠিক তখনই অন্দরমহল থেকে ভেসে এল পিসিমার অনুযোগ-ভরা
কণ্ঠস্বর, ওরে ও চুনী, চান-খাওয়া করবি নে আজ?

চুনী! পৃথিবীর গতি বুঝি স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।
তারপরই কোনকিছু না বলে কে কোথায় ছিটকে চলে গেল ঝড়ের
মত।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে···

দেখতে দেখতে পিল পিল করে লোক এসে ভিড় করতে লাগল পিসিমার বাড়িতে। ছেলে, বুড়ো, বাচ্চা কেউ বাদ নেই। সবার মুখে একই কথা। চুনী! চুনী! চুনী! চুনী এসেছে তাদের গাঁয়ে বেড়াতে! মোহনবাগানের চুনী!

—কিন্তু এ যে একেবারে হাবাতে বুড়ো দেখছি রে! সংশয়ভরে বলল কে একজন।

—আরে যা যা! ধমকে উঠল অন্য একজন, বুড়ো হবে না কেন, শুনি? চুনী গোস্বামী কি আজকের? কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে যা ভেল্কি দেখিয়ে ছাড়ে, আর কেউ তা দেখাক দেখি!

—কিন্তু তা কি করে হবে! তবু সংশয় যায় না ছেলেটির, বহুরূপীর তো তেইশটি বালবাচ্চা। আর চুনী গোস্বামী তো এই সেদিন বিয়ে করেছেন। এরই মধ্যে তাঁর তেইশটি বালবাচ্চা হল কি করে?

—কেন হবে না? কত বড় খেলোয়াড় দেখতে হবে তো!

অকাট্য যুক্তি, সুতরাং সেদিনই বিকেলে সংবর্ধনার ব্যবস্থা হল পাড়ার ক্লাবে। সঙ্গে মানপত্র। হে বাংলার রসিকচূড়ামণি খেলোয়াড়, তোমাকে আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি। পরদিন ড্রামাটিক ক্লাব আর মাইনর স্কুল। তার পরদিন অল বেঙ্গল কীর্তনিয়া সমাজ, জিমনা-সিয়াম আর হরিসভা। তারপর একে একে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, গ্রামোন্নয়ন কমিটি, রিক্সা ইউনিয়ন, বিড়ি শ্রমিক সমিতি ইত্যাদি সবাই। সেই সঙ্গে দুধ-ঘি-ছানা সহকারে আদর-আপ্যায়ন তো আছেই।

প্রতিবাদ করিনি। ইচ্ছা করেই করিনি। আমার ডাকনাম চন্দন। পিসিমা আদর করে ডাকেন, চুনী। তা এই মওকায় যদি চুনী গোস্বামী সেজে মাগ্যি-গণ্ডার দিনে ফোকটে ভাল-মন্দটা ম্যানেজ করা যায় তো মন্দ কি!

বাদ সাধল সেই হাবলা। হঠাৎ সে গুটিকয়েক ছেলেসহ এসে

হাজির। দাবি খুবই সামান্য। পাশের গাঁয়ের সঙ্গে আজ তাদের সেমি-ফাইনাল খেলা। আমাকে সে খেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

আকাশ থেকে পড়লাম ওদের দাবি শুনে। কি সর্বনাশ! বাহাত্তুরে বুড়ো আমি, আমাকে কিনা এ বয়সে মাঠে নামতে হবে ফুটবল খেলতে! তাও কিনা চুনী গোস্বামীর স্ট্যাম্প নিয়ে!

—প্লীজ, এবারের মত আমাদের ইজ্জত রাখুন চুনীদা! এ পর্যন্ত একবারও আমরা ওদের কাছে জিততে পারিনি। ওরাই বরাবর ফাইনালে উঠে কাপ নিয়ে নিয়েছে আমাদের হারিয়ে।

—সবচাইতে খচ্চর হল ওদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ঐ মদনাটা। বলল আর একজন, বল পেয়েছে কি ব্যস, অমনি গোল। ওকে যদি একবার...

—এসেই যখন পড়েছেন, তখন নেমে যান। এবার এগিয়ে এল অভিভাবকের দল, এত করে যখন বলছে ছেলেরা...

—না নেমে যাবে কোথায়? দূর থেকে চাপা গলায় চরমপত্র দিল কে একজন, এটা শিমূলতলা, তা যেন মনে থাকে! টেংরি খুলে নেব না!

অকাট্য যুক্তি। এতদিন অনেক খেয়েছি ওদে পয়সায়। প্রতিদানে কিছু না পেলে আজ ওরা এত সহজে ছাড়বে কেন? কিন্তু এখন উপায়! একে বাহাত্তুরে বুড়ো, তার ওপর বেতো রুগী। তাছাড়া ছেলেবেলায় সেই যে দু'একদিন বাতাবী লেবু দিয়ে খেলেছিলাম, তারপর আর কস্মিন কালেও ও-মুখো হইনি। কি করা যায় এখন এই পরিস্থিতিতে?

—নিন দাদা, দেরি করবেন না। তাড়া দিল ক্লাবের একজন উৎসাহী সভ্য, ঝট্‌পট্ প্যাণ্টটা পরে ফেলুন। আর টাইম নেই।

মিছিল করে সবাই এগিয়ে চলল মাঠের দিকে। সে কি অপরূপ দৃশ্য! চারপাশে হাজার উৎসাহী ছেলেপিলে, আর মাঝখানে হাফপ্যাণ্ট-পরিহিত এই হাবাতে বুড়ো বহুরূপী। তাও প্যাণ্টের কি-

বাহার! ঢলঢলে ঐ প্যান্টটার মধ্যে একসঙ্গে আমার মত গুটিদশেক বহুরূপীকে বোধহয় অনায়াসেই ভরে রাখা যায়।

মাঠের অবস্থাও তেমনি। বৃষ্টিতে সর্বত্র জল জমেছে। কোথাও এক-হাঁটু, কোথাও বা আরো বেশি। অথচ পাঁচখানা গাঁ থেকে এরই মধ্যেই হাজার হাজার লোক এসে জড় হয়েছে চুনী গোস্বামীর খেলা দেখবে বলে।

—একটা কথা! ভয়ে ভয়ে বললাম ক্যাপ্টেন হ্যাবলাকে, মাঠ-ভর্তি জল। এর মধ্যে খেলব কি করে? আজকের মত গোলে খেললে হত না?

—গোলে খেলতে চান? সদয় হল হ্যাবলা, বেশ, তাই খেলুন। তবে ঐ মদনার ওপর একটু কড়া নজর রাখবেন। ওকে কিন্তু বিশ্বাস নেই।

মাঠে নামতেই বিরাট হাততালি। সেই সঙ্গে নানাবিধ মন্তব্য। হবে না কেন, হাজার হোক, অল রাউণ্ডার! যে পোজিশনেই খেলুক না কেন, একেবারে বাঘের বাচ্চা!

কিন্তু একি! খেলা শুরু হতে না হতেই সেই হতচ্ছাড়া মদনাটা বল নিয়ে একেবারে তীরের মত ছুটে আসছে যে! আরো কাছে এসে পড়েছে। একেবারে পাঁচ গজের মধ্যে।

মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকতে লাগলাম ভক্তিভরে। এবারের মত চুনী গোস্বামীর ইজ্জতটা বাঁচিয়ে দাও মা, তোমায় জোড়া-পাঁঠা দেব।

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে বলটা ড্রাম করে আমার কোমরে লেগে আবার যথাস্থানে ফিরে গেল স্প্রিংয়ের মত। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হাততালি। সেই সঙ্গে সরস মন্তব্য, দেখলি তো! কেমন কায়দা করে কোমর দিয়ে বলটা ফিরিয়ে দিলে! আর হবে নাই বা কেন? হাজার হোক, চুনী গোস্বামী। ওর স্টাইলই আলাদা।

এমনি করে একবার দু'বার নয়, বার বার। আশ্চর্য, প্রতিটি বারে সেই একই ব্যাপার। কখনো পিঠে, কখনো কোমরে, কখনো বা পায়ে লেগে নিজে থেকেই বলটা আবার ফিরে যেতে লাগল মাঠের মাঝ-বরাবর। অবশেষে পেনাল্টি। চোখে-মুখে তখন অন্ধকার দেখছি। আর রক্ষা নেই! এবার নির্ঘাৎ গোল!

শট্‌ নেবার উপক্রম করতেই ভয়ে চোখ-মুখ বুজে দিলাম সোজা দৌড়। কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু একি! আশ্চর্য, হঠাৎ আমার টেকো মাথাটার ওপর কি যেন একটা এসে পড়ল দ্রাম করে, তারপরই ছিটকে চলে গেল মাঝ-মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম হাততালির শব্দে। সে কি হাততালি! মুহূর্ত যেন বিরাম নেই তার। সেই সঙ্গে নানাবিধ মন্তব্য। শিখে রাখ, শিখে রাখ। স্টাইল কাকে বলে শিখে রাখ। কেমন কায়দা করে পেনাল্টি ফিরিয়ে দিলে। শিখে রাখ ভাল করে।

খেলা শেষ হতে আর মাত্র মিনিট খানেক বাকি। হঠাৎ আবার বল নিয়ে তেড়ে এল সেই মদনা। এবার সে মরীয়া। যে করে হোক, গোল সে দেবেই।

মনে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন হ্যাবলার সেই সতর্কবাণী। মদনা যতদিন বিপক্ষ দলে রয়েছে, ততদিন তাদের ক্লাবের জেতার কোন আশা নেই। এই লাস্ট চান্স। বাহবা পেতে হলে এই সুযোগে মদনাকে একটু খেল দেখিয়ে দিতে হবে।

আমি ঢাকার ছেলে। আর কিছু না জানলেও কাবাটি খেলায় কি করে ক্যাচ মারতে হয়, তা ভাল করেই জানি। বয়েসকালে এমন অনেককেই মেরেছি। চেষ্টা করলে এখনই কি তার দু'একখানা ছাড়তে পারব না! দেখাই যাক না!

যে কথা, সেই কাজ। বল নিয়ে আর খানিকটা কাছে আসতেই

যা থাকে কপালে বলে মদনার গলা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম এক মোক্ষম ঢাকাইয়া ক্যাচ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পতন, খেলাও সেখানেই খতম।

কানে তালা লেগে গেল হাজার হাজার মানুষের হাততালির শব্দে। সাবাস চুনী গোস্বামী, সাবাস! হ্যাঁ, দেখালে বটে! মদনাটাকে কেমন ঘায়েল করে দিলে কায়দা করে। হবে না কেন? কতবড় খেলোয়াড় দেখতে হবে তো!

মিছিল করে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফিরে এলাম পিসিমার বাড়িতে। পায়ে হেঁটে নয়, সমর্থকদের কাঁধে চেপে। মদনার মত ছেলেকে যে ঘায়েল করতে পারে, তাকে তারা পায়ে হাঁটতে দিতে রাজী হবে কেন?

সেই রাত্রেই কলকাতা পালিয়ে এলাম সবার অগোচরে। সেমি-ফাইনালের পরেই তো ফাইনাল। ওদিকে রোদের তাপে মাঠে জল কমতে শুরু করেছে। শুকনো মাঠে মাল ক্যাচ্ হয়ে যেতে কতক্ষণ!

কার্তিক, ১৩৬৮।

স্নেহের কৃষ্ণা, শম্পা ও নমিতা দিদি—

বেশ কিছুদিন হল তোমাদের চিঠি পেয়েছি। লিখেছ, তোমরা নাকি খুব শিগ্‌গীরই কলকাতায় বেড়াতে আসবে। খুব আনন্দের কথা। চলে এস সবাই। তবে এখন নয়। আর দিন কয়েক বাদে।

কারণ? কারণ, পরে বলছি। না না, ভয়ের কোন কারণ নেই। যা ভেবেছ, তা নয়। আশঙ্কা তোমাদের একেবারেই

অমূলক। সত্যি বলতে কি, মেয়েছেলেটি আমার খুব স্বয়ং এইখানেই। নয়। প্রাণে একটু দয়া-ধর্মও আছে। দোষের মধ্যে একটু গালের কথা করে, এই যা। মরা

তা করুক না। তার মিনসেকে সে গাল-মন্দ করবে, তাতে কার কি! পাড়ার দশজনকে তো আর গাল-মন্দ করতে যাচ্ছে না! সুতরাং, নির্ভয়ে তোমরা আসতে পার। তবে আর দিন কয়েক বাদে।

তাছাড়া হাজার হোক, মেয়েছেলে। সহজাত ধর্মটা যাবে কোথায়? বুঝে-সুঝে, একটু তাল দিতে পারলে দেখবে যে আদিখ্যেতা কাকে বলে! সে রহস্যটাও তোমাদের চুপি চুপি জানিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ কিছু নয়, শুধু তার রান্নার একটু সুখ্যাতি করবে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে গঙ্গাজল। তা যদি না হয় তো তখন আমাকে বোল। এই করে তার মুখের তোড় থেকে কমদিন আমি রেহাই পেয়েছি ভেবেছ!

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। অভিযোগ করেছ, আমাকে চিঠি দিলেও সময়মত তার জবাব পাওয়া যায় না। অভিযোগ মিথ্যে নয়। তবে বিশ্বাস কর যে, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। রোজই ভাবি যে লিখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে না।

কি করে হবে বল? ঝামেলা কি আমার একটা? ওদিকে আমার তেইশটি বালবাচ্চার জননী হার হাইনেস দি গ্রেট্ পদির মা, এদিকে মাথার ওপর দু'দুটো রাক্ষুসে পত্রিকা। একসঙ্গে এতগুলো সামলানো কি চাট্টিখানি কথা! যেদিকে না তাকাব সেদিকেই যে বিপদ! এক মুহূর্ত কি নিশ্বাস ফেলার যো আছে আমার!

তাছাড়া রয়েছে নিত্য-নতুন সভাপতি হবার ঝামেলা। রোজই একটা না একটা পার্টি এসে হাজির: আপনাকে যেতেই হবে স্যার। নইলে এক্ষুণি শুয়ে পড়ব আপনার পায়ের কাছে।

যা থাকে কপালে করার উপায় নেই। কারণ, লাভটা দু'পক্ষেরই। আমার মোক্ষম ঢাংনজ্জের পাবলিসিটি। ওদের লাভ—পত্রিকায় ফাংশনের খবর খতম.পা হওয়া। হাতে যখন কাগজ রয়েছে, তখন সভাপতির ছবিটা যে বেশ ভাল জায়গা দেখে ছাপা হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঐ সঙ্গে ক্লাবের নামটাও।

মিথ্যে বলব না, ফুলের মালা গলায় দিয়ে সভাপতি সাজতে খুব একটা মন্দ লাগে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ভাষায় একজন 'প্রিবীণ বেক্তি' বলেই তখন মনে হয় নিজেকে। তাছাড়া বেশ ভাল-মন্দ খাওয়াটাও জুটে যায় মাঝে মাঝে। সর্বোপরি পান, সিগ্রেট, কোকাকোলা, ট্যাক্সিভাড়া এসব তো আছেই। মাগ্যি-গণ্ডার দিনে এ কি চাট্টিখানি কথা, বল ?

তবে বড্ড হাসি পায় এক এক সময়ে। হাসি পায় নিজের অবস্থা ভেবে। এককালে আমার কি প্রচণ্ড রাগই না ছিল এই সভাপতি-গুলির ওপর। কোথায় ফাংশনে গিয়ে একটু নাচ-গান দেখব, তা নয়, অমনি শুরু হল সভাপতির লেকচার। কেন বাপু ? লেকচার দেবার ইচ্ছে থাকে তো মনুমেণ্টের নিচে গিয়ে দিলেই তো হয়! ফাংশনে কে তোমাদের আসতে বলেছে লেকচার দেবার জন্য ? ভাগো হিঁয়াসে। নয়তো এক্ষুণি শালা তোমাকে তুলে দেব হাততালি দিয়ে।

সত্যিই আজ হাসি পায় সেসব কথা ভেবে। তবে হাসিনে ; সভাপতিকে হাসতে নেই কিনা। তাই জোর করেই চুপচাপ বসে থাকি সভাপতিসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে।

তারপর সভাপতির ভাষণ। প্রথম প্রথম দু'একদিন অবশ্য একটু অসুবিধে হয়েছিল, কিন্তু এখন একনাগাড়ে আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়া তো মোস্ট ইজি ব্যাপার। ওটাই দস্তুর। আড়াই ঘণ্টার আগে সভাপতিকে থামতে নেই। তাতে তার প্রেস্টিজ থাকে না।

সবশেষে সভাপতি বিদায়। আসল মজা কিন্তু এইখানেই। অবশ্য ট্রেড সিক্রেট কাউকে বলাটা ঠিক নয়, তবু তোমাদের কথা আলাদা। একথা ফাঁস করে দিয়ে অ্যাজ এ সভাপতি তোমরা যে আমাকে আউট অফ লাইন করে দেবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

তাহলে শোন। এই তো মাস দুয়েক আগেকার কথা। সেদিনও ফাংশন শেষে সেই একই ব্যাপার। অর্থাৎ, ট্যাক্সি এসে গেছে স্যার। সঙ্গে যেতে পারছি নে বলে কিছু মনে করবেন না যেন! দেখতেই তো পাচ্ছেন। বড্ড লোকাভাব আমাদের। এই নিন ভাড়াটা।

আবার নর্থ ক্যালকাটা টু সাউথ ক্যালকাটা। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ছাতুবাবুর বাজার আসতে না-আসতেই ট্যাক্সি বিদায়। তারপর দিব্যি একটি ইলিশ মাছ নিয়ে সোজা ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস।

কেন, লজ্জার কি আছে! চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি! আমার হকের জিনিস দিয়ে আমি যা খুশি তাই করব, তাতে কার কি! অমন সবাই করে। আহা, মাছ দেখে সে কি একগাল হাসি মেয়েছেলেটির! দেখে কে বলবে যে, আজ ভোরে এই মানুষটি আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়েছিল!

এখানেই শেষ নয়। আরো লাভ আছে। মিথ্যে বলব না তোমাদের, ফুলের দোকানে মালাটা ফেরত দিয়েও পেয়ে থাকি কিছু কিছু। অন্তত দু'চার বাণ্ডিল বিড়ির দাম তো বটেই। মাগ্যি-গণ্ডার দিনে এ কি কম লাভ, বলো?

চিরদিন কারো সমান যায় না। আমারও গেল না। বাদ সাধল ঐ মালাটাই। সেই দুঃখের কাহিনীই এবার তোমাদের বলব।

দিন তিনেক আগেকার কথা। হঠাৎ সেদিন ভোরে এক ফাংশন-

পার্টি এসে হাজির। বক্তব্য সেই একই। —আমাদের ফাংশনে আজ আপনাকে সভাপতি হতে হবে বড়দা।

—সে কি কথা? সভাপতিসুলভ বিনয় দেখিয়ে বললাম, এত লোক থাকতে আবার আমাকে কেন?

—কি যে বলেন বড়দা! বাংলাদেশে কোন্ শালার এতবড় হিম্মৎ যে, আপনার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে! লাস্ট ইস্যুতে বড়দার দপ্তরটা তুই পড়েছিস ভল্টে? পারিস তো পড়ে দেখিস। আঃ! সে কি ভড়কি মাইরি! তুই তো তুই, ও ভড়কি শুনলে আমাদের লীডার দাদারা পর্যন্ত মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। না না, আপনাকে যেতেই হবে বড়দা। নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।

—দেখ দেখি কাণ্ড! ডাঁট দেখিয়ে বললাম, আমি যে আবার অন্য এক জায়গায়...

—গুলী মারুন! এই ভল্টে, বড়দার জন্যে খুব ভাল দেখে মালার ব্যবস্থা রাখবি কিন্তু। এ তো আর তোদের রেডিমেড সভাপতি নয় যে, যাবার জন্য এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! হাজার হোক, বহুরূপী। সুতরাং মালাটা এমন হওয়া চাই যে, বৌদি যেন দেখে খুশি হয়। তাহলে ঐ কথাই রইল বড়দা, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমরা ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। কিছু ভাববেন না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

সচরাচর যা হয়, সেদিনও তাই হল। অর্থাৎ: এই নিন ভাড়াটা। ট্যাক্সি রেডি। এবার উঠুন।

সেদিন কিন্তু ট্যাক্সি চেপেই সোজা বাসায় ফিরে এলাম। কারণ ঐ মালাটা। সত্যিই অপূর্ব। সভাপতিরূপে এমন দামী মালা এর আগে কোনদিনও পাইনি। এমন মালা সবাইকে দেখিয়েও সুখ। বিশেষ করে ঘরের মেয়েছেলেটিকে। সকাল-সন্ধ্যে আমার ওপর সে কি চোটপাট মেয়েছেলেটির, 'নেকক না কচু! অমন নেকা নাকি তিনিও নিকতে পারেন।' আজ দেখুক যে, অ্যাজ এ সভাপতি

আমারও একটা বক্স-অফিস আছে কিনা। ভাল করে চেয়ে দেখুক। আহা, মালাটা দেখে কি খুশিই না হবে। সেই কবে শুভরাত্রির দিনে এমনি একটা মালা জুটেছিল। তারপর আর জোটেনি। সুতরাং খুশি তো হবারই কথা।

ঘরে ঢুকতেই শ্রীমতী অবাক। একি! মালা কেন? ইলিশ মাছ কোথায়?

ঐ এক মুহূর্ত। তারপরই হঠাৎ প্রশ্ন হল: মালাটা তোমাকে কে পরিয়ে দিলে গা? ছেলে, না মেয়ে? নিশ্চয়ই মেয়ে! দেখতে কেমন? বয়েস কত? বয়স্থা বুঝি?

—না না, ঠিক তা নয়। ভড়কে গিয়ে বললাম, মানে…মানে…

—থাক. আর মুখ নেড়ে কথা বলতে হবে না। তাই তো ভাবি যে, হঠাৎ রোজ রোজ সভাপতি হবার জন্য এমন শখ কেন?

—না না, তা নয় গিন্নী। ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যাপারটা…

—আর ব্যা-ব্যা করতে হবে না, বেহায়া পুরুষমানুষ কোথাকার! আমার সবাইকে চেনা আছে। আর কাকেই বা কি বলব! নইলে বাহাত্তর বছরের ঘাটের মড়া, চব্বিশটে বালবাচ্চার বাপ, তবু কিনা মাথার চুলে এ পর্যন্ত একটু পাক ধরল না! একটা দাঁত পর্যন্ত পড়ল না! ওগুলো গেলে তবু একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তা মুখপোড়া ভগমানের কি সেদিকে কোন হুঁশ আছে! আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি। এই তিন সত্যি করে বলছি, এর পিতিশোধ আমি নেব—নেব—নেব। তা যদি না পারি তো আমার নাম পদির মা-ই নয়।

ব্যস, শুরু হল অনশন ধর্মঘট। তারপর তিনদিন ধরে কত অনুরোধ, কত সাধ্য-সাধনা, কত রান্নার সুখ্যাতি, কিন্তু সব বৃথা। তার সাফ কথা, এ সংসারে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। সুতরাং অনশনে আত্মহত্যে করে তিনি তার পিতিকার করবেন। আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে এটাই নাকি মোক্ষম পন্থা।

সুতরাং, তোমাদের জানাচ্ছি যে, আসতে চাও তো এস, তবে ঠিক এখনই নয়। দিনকয়েক বাদেই বরং এস। ফলের রস রেডিই রেখেছি। আমৃত্যু অনশনের অবসান ঘটুক, তারপর যেদিন খুশি চলে এস। আর হ্যাঁ, রান্নার সুখ্যাতি করতে ভুলো না যেন। নইলে কিন্তু অদৃষ্টে তোমাদের অনেক দুঃখ আছে, তা আগেই জানিয়ে রাখছি।

মাঘ, ১৯৭০।

ফুল। শুধু একমুঠো ফুল। সবে পাপড়ি মেলেছে। নরম। তুলতুলে। ঝুরঝুরে। ফুরফুরে।

নিজের গন্ধে নিজেই বিভোর। শান্ত। স্নিগ্ধ। সমাহিত। দীঘির কালো-জলের মত। কস্তুরী মৃগের মত। বিহ্বল। তন্ময়। উন্মনা। দিশেহারা। মাতাল। পাগল।

কিছু বোধগম্য হল কি আপনাদের? নিশ্চয়ই হয়নি। কি করেই বা হবে! ছাই, আমি নিজেই কি কিছু বুঝেছি! তবু আজ আমাকে এমনি করেই লিখতে হবে। কারণ, এটা আপনার-আমার মত কোন সাধারণ লোকের কাহিনী নয়। এ হল একালের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ধ্যান-জ্ঞান-জপমন্ত্র—তারকাদের কথা। সোজা কথায় উঠতি তারকা কুমারী কুন্তলা সেনের সঙ্গে বহুরূপীর সাক্ষাৎকারের বিবরণী। সুতরাং এ [illegible] আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ভাষার খই ফুটিয়ে লিখতেই হবে।

না লিখে উপায়ও নেই। কারণ, তারকাদের কথা সহজ ভাষায় লেখা যায় না। লিখলেও তাতে ওঁরা খুশি হন না। পাঠক-পাঠিকাদেরও ভাল লাগে না। নিজেরও মন ভরে না। সুতরাং বাধ্য

হয়েই আমাকে এমনভাবে লিখতে হবে, যার অর্ধেক কথারই রেজী মানে হয় না।

সকাল ন'টা। কলিংবেল টিপতেই পরিচারিকা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, কাকে চাইছেন?

জবাব দিলাম, কুন্তলা দেবী আছেন কি! আমার নাম বহুরূপী। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছি।

—আসুন। উনি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

খুশিই হলাম মনে মনে। কাকে কি বলতে হয় সে সব কায়দা-কানুন ওরা বেশ ভাল করেই জানে। তারকার পরিচারিকা কিনা!

ভেতরে পা দিয়েই অভিভূত হয়ে গেলাম। কে! কে! কে এই অসামান্যা! কে এই অপরূপা! আমি বিস্মিত। মুগ্ধ। কে ইনি! উর্বশী! মেনকা! রম্ভা! পদ্মিনী! দুর্গাবতী! রাণী ভবানী! হিড়িম্বা! সূর্পনখা! কি এর পরিচয়?

ইনি শিল্পী। উদীয়মানা তারকা কুন্তলা দেবী। প্রিয়দর্শিণী। স্বপনচারিণী। ভুবনমোহিনী। সরস। সুঠাম। সতেজ। চুইয়ে চুইয়ে গ্ল্যামার ঝরছে সর্বাঙ্গ দিয়ে।

কেমন লিখেছি বলুন দেখি! বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখেছি, কি বলেন? যাক, পরেরটুকু শুনুন।

আমাকে দেখেই দু'হাত তুলে বললেন কুন্তলা দেবী, নমস্কার!

আমি অসাড়। বিহ্বল। অনিশ্চিন্ত। দিশেহারা। কি মিষ্টি কণ্ঠ! একসঙ্গে শত সহস্র বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যেন।

হলপ করে বলতে পারি যে, এমন সুরেলা কণ্ঠ ইতিপূর্বে আপনারা কেউ কখনো শোনেননি। অপূর্ব। সত্যিই অপূর্ব। ঠিক যেন—ঠিক যেন ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত

উঁহু, চলবে না। সত্যি হলেও সেন্সার অফিসার এই লাইনটার ওপর ঠিক কাঁচি চালাবে। কারণ, তারকাদের সম্বন্ধে সব সময়েই

· একটু পার্সেণ্টেজ বাড়িয়ে বলতে হয়। তাই সংশোধন করে বলছি, কি অপূর্ব কণ্ঠ! বাঁশির মত। বেহালার মত। কোকিলের মত।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!

ঠোঁটের ফাঁকে দু'পাটি দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠল কুন্তলা দেবীর। ঠিক মুলোর মত। এই যাঃ! ভুলে হক কথা লিখে ফেলেছি। প্লীজ, ওটা একটু কারেকশন্ করে নিন। ওটা হবে মুক্তোর মত।

সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে বললাম, আপনার জীবনীটা···

—ওসব পরে হবে। আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

বলেই লাফাতে লাফাতে ভেতরে চলে গেলেন কুন্তলা দেবী। ঠিক কোলা ব্যাঙের মত।

এই সেরেছে! আবার হক কথা বলে ফেলেছি। ওটা পালটে নিন। ওটা হবে···ওটা হবে···নাঃ! জুতসই ধরনেব একটা শব্দও মনে আসছে না। ঝকমারি আর কাকে বলে! থাকত যদি হাতের কাছে শ্রীমান অমল চক্রবর্তী বা দখ্নেবাসী আমাদের বিষ্টুব ভাষায়, 'আমকৃষ্ণ আয়' (রামকৃষ্ণ রায়), তাহলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্বি তাহলে ম্যানেজ করে নেওয়া যেত।

সত্যি কথা বলতে কি, এসব ব্যাপারে ওরা হল যাকে বলে গুরুদেব মানুষ। ওদের কালির আঁচড়ে খ্যাঁদা নাকও টিকোলো নাকে পরিণত হয়। জবাফুলের মত লাল টকটকে চোখকেও ওদের কাজল-কালো আঁখি বলে আখ্যা দিতে বাধে না। আর অসংখ্য ব্রণ ভরা উঁচু-নিচু গালকে, রাঙা আপেলের সঙ্গে তুলনা করা তো বলতে গেলে ওদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কিন্তু আমি দাদা এক কথার মানুষ। যা সত্যি, তাই বলি। এসব কাজ কি আমার সাজে! অথচ উপায় নেই। কর্তৃপক্ষের

নির্দেশ—এবারের ফিচারটা বহুরূপীকেই লিখতে হবে। বুঝুন ঠেলা। যাক, বাকিটা শুনুন।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হল। চা, না কাঁচকলা। স্রেফ মিথ্যে কথা। তবু লিখতেই হবে। তারকাদের জীবনী লিখতে গেলে সর্বাগ্রে নাকি চায়ের কথা লিখতে হয়। না খাওয়ালেও লিখতে হয়। ওটাই নাকি দস্তুর।

শুধু চায়ের কথা লিখলেই চলবে না। সেই সঙ্গে আরো লিখতে হবে যে, কুন্তলা দেবী শুধু অভিনয়েই পারদর্শী নন, রান্নাবান্নার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ পটু। অবসর সময় তিনি রান্নাবান্না নিয়েই কাটান।

চায়েব পালা চুকে যাবার পরে আধো আধো ভাঙা অর্ধোচ্চারিত স্বরে নিজের কথা বলতে শুরু করলেন কুন্তলা দেবী।

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন। দিন রাত দেখি। অজস্র স্বপ্ন। রাশি রাশি স্বপ্ন। একটার পর একটা। অসংখ্য। প্রশান্ত উষায়। নিস্তব্ধ দুপুরে। আর ছায়াঘন বিকেলে।

কিন্তু কিসের স্বপ্ন! জানি নে। দিনরাত ভাবি, তবু বুঝি নে। কবিতাব বইটি হাতে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তখন তাকিয়ে থাকি আকাশের পানে। মন চলে যায় দূরে। অনেক দূরে ঃ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আরো দূরে।

কত রঙ! কত রামধনু! কত কল্পনা! হারিয়ে ফেলি। নিজেকে হারিয়ে ফেলি। অবোধ শিশুর মত। ভুলে যাই। সব ভুলে যাই। মনে হয়, আমি কে? কি আমার পরিচয়? কোথায় আমার পথের শেষ সীমা? কোথায় আমার তরী গিয়ে থামবে কূলের সন্ধান পেয়ে? সহসা ঝড় ওঠে। তরী টলমল। মনে হয়, আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি অতল তলে। অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। চাপ চাপ কালো অন্ধকার।

কি বললেন? কিছুই বোধগম্য হল না? আমি নাচার। এর

৻তে সোজা ভাষায় তেনাদের কথা লেখা যায় না। লিখলে চাকরি যাবে। যাক, পরেরটুকু শুনুন।

প্রশ্ন করলাম, আপনার শিল্পী-জীবন সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

—কি আর বলব! ভাসা ভাসা স্বরে জবাব দিলেন কুন্তলা দেবী, এই তো সবে ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছি। জীবনে কতটুকুই বা দেখেছি! তবে এ বিষয়ে আমার বাবার কাছ থেকে বরাবরই আমি উৎসাহ পেয়েছি। সে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। বাবা প্রায়ই তখন আমাকে বলতেন···

কি বিরাট প্রতিভা! সপ্তদশী হলেও ত্রিশ বছর আগে বাবা কি বলতেন তা ঠিক মনে আছে। জিনিয়াস কি আর সাধে বলে! আমি চিত্র-সাংবাদিক। কোন অবস্থাতেই আমাকে ঘাবড়াতে নেই। তদুপরি উনি আমাকে চা' খাইয়েছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি লিখব যে, সপ্তদশী কুন্তলা দেবী বাবার কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

—বাবার প্রেরণাই আমাকে সার্থক শিল্পী হতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। আজ আমি শিল্পী। শিল্পই আমার ধর্ম। তবু পারিনি অন্য দশটি শিল্পীর মত নিজেকে অর্থের কাছে বিকিয়ে দিতে। এখানেই আমার বিশেষত্ব। অভিনয় আমার পেশা নয়, নেশা।

একদিন টাকা পেতে সামান্য দেরি হলে খিস্তির চোটে যিনি গোটা স্টুডিওটাকে অন্ধকার করে তোলেন, অভিনয় তাঁর কাছে নেশা ছাড়া আর কি হতে পারে! তাই আমি লিখব যে, অভিনয়ই তাঁর জীবন। অভিনয়ই তাঁর সাধনা। অভিনয়ই তাঁর একমাত্র তপস্যা। অর্থের বিনিময়ে নিজের প্রতিভার অপচয় করতে তিনি ঘৃণা বোধ করেন।

আলমারী ভর্তি বইগুলোর পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি বুঝি বই পড়তে খুব ভালবাসেন?

—ওটা আমার আর একটা নেশা। এমন কোন ভাল ইংরেজী বই নেই, যা আমার এখানে পাবেন না।

—ফ্রয়েড এবং বার্নাড শ' সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

—অ্যাজ এ ডাইরেকটার ফ্রয়েডকেই আমার বেশি ভাল লাগে। এই তো গত সপ্তাহে আমি একটা অফার পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। ওঁর একান্ত ইচ্ছে আমাকে হিরোইন করে একটা ছবি করা। আমি রাজী হইনি। সচরাচর ওঁর ছবি এলে কক্ষণো আমি মিস করি নে।

না না, ফিল্ম জার্নালিস্ট হিসেবে নিজের কলমের অমর্যাদা আমি কিছুতেই করব না। সুতরাং লিখব যে, অবসর সময়ে কুন্তলা দেবী তাঁর নিজের লাইব্রেরীতেই বই পড়ে কাটান। ফ্রয়েড এবং বার্নাড শ' ওঁর কণ্ঠস্থ।

আরো কিছুক্ষণ বক্‌বক্ করে অবশেষে অপরিসীম ক্লান্তিতে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন কুন্তলা দেবী। চোখে তাঁর স্বপ্ন। কি করে নিত্য-নতুন কায়দায় প্রডিউসারকে টাইট দেওয়া যায়, সেই স্বপ্ন।

কিন্তু আমি তা লিখব না। লিখব, কুন্তলা দেবীর দু'চোখে স্বপ্ন। কি করে চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যতকে আরো সম্ভাবনাময় করে তোলা যায়, সেই মহৎ স্বপ্ন।

পৌষ, ১৯৬৮।

শুনেছি নেশা-ভাঙ করা নাকি আর চলবে না। টেকচাঁদ কমিটি নাকি তাই সুপারিশ করেছেন আমাদের সরকারের কাছে। বলেছেন, মদ, গাঁজা, তাড়ি, চরস ইত্যাদি যতরকম নেশা আছে, সব তুলে

দেওয়া হোক আমাদের দেশ থেকে। এর কোন মানে হয়!" আপনারাই বলুন না?

অবশ্য সরকার এখনো কথাটায় তেমন গা করেননি। করেননি স্বাভাবিক কারণেই। কারণ, দেশবাসী নেশা করলে তাদেরই লাভ। খেয়ে মাতলামী করলে আরো লাভ। এ হেন লাভজনক ব্যবসায়কে এককথায় ছুট্ করে তুলে দেয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবার সুবিধেটাই দেখতে হবে তো! মাদকদ্রব্য তুলে দেয়া হলে কি কববেন তখন শত শত ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখকগণ? কি করবেন হিন্দী চিত্র-জগতের অধিকাংশ কাহিনীকারগণ? কি করবেন তথাকথিত পরিচালকগণ, যাঁরা সাড়ে তিন মিনিটের একটি গানের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করতে সক্ষম? কি দিয়ে তখন আমাদের দেশের ভি. আই. পি.-গণ আপ্যায়ন করবেন তাঁদের পেটোয়া জার্নালিস্টদের? চিত্র-জগতের কক্‌টেল পার্টিরই বা কি হবে? কি হবে আমাব প্রতিবেশী গজানন সরখেলের?

অবশ্য সরখেলমশাই জলপথের যাত্রী নন, বাবা তাবকনাথের ভক্ত। তাই বা কম যায় কিসে! বরং বনেদীয়ানার দিক থেকে বিচার করতে গেলে বড় কল্‌কের ভক্তরাই যে জাতে কুলীন, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাছাড়া উদ্যোগ-আয়োজনই বা কত! সে এক দেখার মত জিনিস বটে। সত্যি বলতে কি, এমন উপভোগ্য দৃশ্য রবীন্দ্র সরোবরেও দেখা যায়নি।

কবে, কোন্ জন্মে ওঁর কাছ থেকে শ'খানেক টাকা ধার নিয়ে-ছিলাম, আজ আর সেকথা ভাল করে মনেও নেই। বলা বাহুল্য যে, টাকাটা আর ফেরত দিইনি। ইচ্ছে করেই দিইনি। টাকা ধার নিলেই যে আবার তা ফিরিয়ে দিতে হবে, তার কি মানে আছে! আজ্ঞে না, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

ওর নিজেরই যে তার জন্য খুব একটা মাথাব্যথা আছে, তা নয়। সত্যি বলতে কি, এসব ব্যাপারে বাবার ভক্তরা চিরদিনই বেশ একটু উদার। আর যাই হোক, পাওনা টাকার জন্য কোনদিনই ওরা তাগাদা দেয় না।

কিন্তু বাবার পেসাদটি একবার হাতে নিয়েছে কি ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে অন্য চেহারা। হাতের চেটোতে পেসাদটি টিপতে টিপতে সে কি তখন তর্জন-গর্জন!। দেখে নেব আমি বহুরূপীকে। সেই কবে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, এখনো সে টাকা ফিরিয়ে দেবার নাম নেই! আচ্ছা, আমিও গজানন সরখেল। কোনদিন যদি মওকামত পাই তো সেদিন ওকে আমি এমনি করে টিপে টিপে মারব, নইলে আমার নাম গজানন সরখেলই নয়। এই পেসাদ ছুঁয়ে বলছি।

পেসাদ তৈরি। এবার চাই কয়েক ফোঁটা জল। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ালগ চেঞ্জ। ওকে আমি এমনি করে জলে ডুবিয়ে মারব। যাবে কোথায় বাছাধন! ওর বহুরূপীগিরি আমি বার করে দেব না!

তারপর ব্লেড দিয়ে কুচি কুচি কবে কাটার পালা। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডায়ালগ চেঞ্জ। ওর গলায় আমি এমনি ক্যে ব্লেড চালাব। চেনে না তো আমাকে! টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়!

তারপর অগ্নি-সংযোগ। সেখানেও সেই বীরবিক্রম। ওর পদির মা-র মত আমিও ওর মুখে এমনি করে আগুন দেব। এক্ষুণি দেব। আগুনে পুড়িয়ে মারব ওকে।

তারপর টান। আরে বাসরে বাস! সে কি টানের বহর! একটানে কল্‌কের মাথাটা দপ্‌ করে জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত কিছুতেই বুঝি এই টানের আর শেষ নেই।

অতঃপর মিনিট কয়েক চুপচাপ। তারপরই যাকে বলে একে- বারে ব্যোম ভোলানাথ। যা বেটা, এবারের মত তোকে মাপ।

করে দিলাম। আর দিবিই বা কি করে! ঘরে চব্বিশটি বালবাচ্চা। চাট্টিখানি কথা তো আর নয়! যা, ও টাকাটা তোকে আর দিতে হবে না।

এবার শুনুন জলপথের কথা। সেখানের রীতি-নীতি অবশ্য আলাদা। দেহ অবশ। দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। তবু বড়াই ছাড়তে কেউ রাজী নয়। সবার মুখে একই কথা। আপনারা কি ভেবেছেন আমি ডাউন হয়েছি! নেভার। ওসব পেঁচো মাতাল আমি নই।

বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র চরিত্র। কেউ একদম চুপ, কারো কিছুটা হল্লা করা চাই-ই, নইলে নাকি মুড আসে না। কারো বা এমন সব বিচিত্র বাতিক দেখা যায়, যা একমাত্র জলপথের যাত্রী ছাড়া আর কোথাও বড় একটা নজরে পড়ে না।

যেমন, নিমাইবাবু। দু'চার পেগ্ পেটে পড়েছে কি ব্যস, অমনি শুরু হবে তার ভেউ ভেউ করে কান্না। বউয়ের কথা বলে সে কি তখন তার করুণ বিলাপ! জানেন মশাই, মাল খাবার পরে বউটার কথা ভাবলে আমার ভীষণ দুঃখ হয়!

—দুঃখ হলে খান কেন?

—দুঃখ হয় বলেই তো খাই।

ব্যস, অকাট্য যুক্তি। সুতরাং মাল তিনি রেগুলারই খাচ্ছেন, এবং খাবেনও। দুঃখ ভুলতে হবে তো!

তবে বিষ্ণুবাবু এ ব্যাপারে খুব একটা অভ্যস্থ নন। খেতে খেতে নিজেই তিনি বলে থাকেন সেকথা। আমি মশাই রেগুলার খাই নে। শখ হলে কখনো-সখনো একটু খাই আর কি! তবে রেগুলার নয়।

যেমন ধরুন বৃহস্পতিবার। এদিন একটু খেয়ে থাকি। রেসের বই ওদিনই বেরোয় কিনা। খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু স্পেকুলেশন করতে হবে তো!

তারপর ধরুন গে শুক্রবার। ওদিনও একটু না খেয়ে পারি নে। পরদিনই রেস। কি হবে কে জানে। তাই নিজেকে একটু মজবুদ রাখা আর কি!

তারপর ধরুন গে শনিবার। ওদিন তো খেতেই হবে। মাঠে কিছু পেলে সাধ মিটিয়ে খাই, না পেলে মনের দুঃখে খাই। তবে রেগুলার আমি কোনদিনও খাই নে। মাঝে মাঝে স্লাইট একটু খেয়ে থাকি আর কি!

তারপর ধরুন গে রবিবার। বাঃ! হাজার হোক, ছুটির দিন! ওদিন একটু সাধ-আহ্লাদ করব না! এ কি অন্যায় কথা!

তারপর সোমবার। পুরো দেড়দিন ছুটির পরে অফিস। কি যে ধকল যায় সেদিন শরীরের ওপর দিয়ে তা শুধু আমিই জানি। একটু না খেলে শরীর টিকবে কি করে!

তারপর মঙ্গলবার। মঙ্গলবার ক্লাবে আমাদের তাস খেলার দিন। অনেকদিনের পুরোনো ক্লাব। বাধ্য হয়েই যেতে হয় সেখানে। খেতেও হয় একটু। হাজার হোক বন্ধু। তাদের মনে তো আর দুঃখ দিতে পারি নে!

আর বুধবার: ওদিন তো খাবই। বুধবার আমার জন্মদিন কি না। নিজের জন্মদিনে শুকনো মুখে থাকব, তা কি হয় কখনো? কর্তব্য বলে একটা কথা আছে তো। তবে রেগুলার আমি কোন-দিনই খাই নে। কখনো-সখনো শখ হলে স্লাইট একটু খেয়ে থাকি আর কি!

টেকচাঁদ কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হলে এ হেন যুক্তিবাদী লোকগুলোকে আমাদের হারাতে হবে না কি? আপনারা কি বলেন?

তবে যে যতই যুক্তি দেখাক না কেন, এ ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন আমাদের মহেন্দ্রবাবু। সত্যি বলতে কি, জলপথের যাত্রীদের মধ্যে এতবড় প্রতিভার নিদর্শন ইতিপূর্বে কেউ কোনদিনও দেখাতে পারেনি।

এযুগে কে না ঘুষ খায়! কি ছোট, কি বড়, কে না এ ব্যাপারে সমান উৎসাহী! সত্যি বলতে গেলে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করার কথা কেউ বোধহয় চিন্তাই করতে পারে না আজকাল।

একমাত্র ব্যতিক্রম পুলিশ। না, ঐটি ওদের মধ্যে পাবেন না। কি গল্প, কি সাহিত্য, কি সিনেমা, কি আইন-আদালতের পাতা, কোথাও এমন কোন নজীর নেই, যেখানে পুলিশের ঘুষ খাবার কথা স্বীকৃতি পেয়েছে।

তা বলে ব্যতিক্রম বলে কিছু নেই, তা নয়। তবে সেটা ঘুষ নয়। পান খাবার জন্য কেউ যদি খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চায় তো, তাকে আর যাই হোক, ঘুষ বলা চলে না।

এমনি একজন পান-খানেওয়ালা পুলিশ হল ভগবতীপ্রসাদ। তার কাজই হল বারের বাইরে দাঁড়িয়ে অল্পবয়েসী, অনভিজ্ঞ মাল-খানেওয়ালাদের প্রতি খবরদারী করা। অর্থাৎ, কারণে-অকারণে—'চলিয়ে থানামে।'

সাধ করে কে আর থানায় যেতে চায়? বিশেষ করে নতুন মাল-খানেওয়ালারা তো নয়ই। কে জানে কথাটা পাঁচ কান হয়ে যাবে কি না! তার চাইতে এই নাও বাপু তোমার পান খাবার পয়সা। এবার রেহাই দাও।

ভুল সবারই হয়। ভগবতীপ্রসাদেরও হয়েছিল। তাই হঠাৎ সেদিন সে মহেন্দ্রবাবুকেই ধরে বসল ভুল করে। চলিয়ে থানামে।

—কারণ? ঘুরে দাঁড়ালেন মহেন্দ্রবাবু।

—আপ্ দারু পিয়া। অভিযোগ পেশ করল ভগবতীপ্রসাদ।

—হ্যাঁ, পিয়া। খাবার জিনিস—খাব না কেন? পয়সা দিয়ে খেয়েছি। বাকি বা ফোকটে খাইনি।

—হাঁ হাঁ, ও তো ঠিকই হ্যায়। লেকিন যা বুলবার বড়বাবুর কাছে গিয়ে বুলবেন। আভি-চলিয়ে থানামে।

—তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায় বাপু?

—আপ্ রাস্তা পর হল্লা কিয়া।

—হল্লা! ইতিমধ্যেই রাস্তায় লোক জমতে শুরু করেছে একটি-দুটি করে। এবার তাদেরই সাক্ষী মানলেন মহেন্দ্রবাবু, আপনারা তো মশাই সবই দেখেছেন। আমার কথাবার্তা বা চালচলনের মধ্যে কোথাও আপনারা এতটুকু বেচাল কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?

দিনকাল ভাল নয়। কখন কি ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না। তাই এবার নিজে থেকেই পিছু হটল ভগবতীপ্রসাদ।

—ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি। লেকিন ফিন কভি দারু পিয়েগা তো···

—মানে! তুমি আমাকে মাল খেতে মানা করছ? তার মানে, সরকারের লোকসান হোক, তাই তুমি চাও? উঁহু, এ তো ভাল কথা নয়!

—ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। বলেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করল ভগবতীপ্রসাদ। কিন্তু সব বৃথা। তার আগেই খপ্ করে তার হাত চেপে ধরলেন মহেন্দ্রবাবু।

—যাতা কাঁহে সিপাইজী? আগে একটা ফয়সালা হোক, তবে তো। চল তোমার বড়বাবুর কাছে। তারপর কথা ৃর্তা যা হবার সেখানেই হবে।

—কেন ঝামেলা করছেন বাবুজী! বিপন্নের মত বলল ভগবতী-প্রসাদ, চলে যান না যেখানে খুশি। আমি তো আপনাকে ছোড়িয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে ছাড়ছি নে।, এখান থেকে থানা আর কতক্ষণের পথ! যেতে-আসতে বড়জোর বিশ মিনিট। চল, তোমার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

একরকম ঠেলতে ঠেলতেই ভগবতীপ্রসাদকে নিয়ে থানা অভিমুখে রওনা দিলেন মহেন্দ্রবাবু। তবে বেশিক্ষণ নয়। মিনিট তিনেক

ব্যাগে ফিরে এসেই সটান বারে ঢুকে তিনি আদেশ দিলেন, বয়, আউন্স টু' পেগ।

সবাই অবাক। কি হল মশাই? এরই মধ্যেই ফিরে এলেন যে!

—ম্যানেজ। মহেন্দ্রবাবু গম্ভীর।

সবাই হতভম্ব। কি বলতে চাইছেন মহেন্দ্রবাবু? ম্যানেজ মানে?

—মানে ঘুষ। মহেন্দ্রবাবু তেমনি গম্ভীর।

সবাই স্তম্ভিত। কি ব্যাপার? কাব কাছ থেকে ঘুষ খেলেন মহেন্দ্রবাবু?

—কেন, পুলিশের কাছ থেকে।

এর পরেও কি মাদকদ্রব্য বর্জন প্রস্তাব সমর্থন করা আমাদের পক্ষে উচিত্ হবে? আপনারাই ভেবে দেখুন!

বৈশাখ, ১৯৬৯।

—কি! কি বললে? খুকি সিনেমায় নামবে! তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে বড়বৌ! লজ্জাও হল না তোমার! যাক, ভবিষ্যতে একথা যেন আমার সামনে আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কব না, এই তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

—কেন, দোষ কি? সবাই তো নামছে আজকাল!

—সবার কথা ছেড়ে দাও। তারা আর যাই হোক, শিমুল-তলার দত্ত-বংশের মেয়ে নয়। তাছাড়া অভিনয় করতে সবাই পারে না।

—কেন, সবাই তো বলছে যে খুকি পারবে। এই তো কালও

দু'জন ডিরেক্টর এসেছিল। তারাও বললে যে ওর নাকি বেশ প্রতিভা আছে।

—হ্যাঁ, প্রতিভা! প্রতিভা দেখে ওরা ভোলেনি, ভুলেছে তোমার মেয়ের রূপ-যৌবন দেখে, বুঝেছ?

—তবু চেষ্টা করলে কিছু যদি সুবিধে হয়...

—মানে! তাহলে তুমিও চাও যে তোমার মেয়ে দশজনকে গা দেখিয়ে টাকা রোজগার করুক! ছিঃ ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারি নে। বলি, চোখ নেই তোমার? কাগজে কাগজে, দেয়ালে দেয়ালে কি ধরনের সব নোংরা ছবি দেখা যায় তা নজরে পড়ে না তোমার? এর নাম প্রতিভা? এর নাম আর্ট? ছিঃ! এই করে যদি টাকা রোজগার করতে হয় তো অমন টাকার মুখে আমি দশবার করে লাথি মারি।

—কিন্তু একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে...

—চুপচাপ বসে নেই বড়বৌ, চুপচাপ বসে নেই। ব্যবস্থা যা করবার তা আমি ঠিকই করছি। তোমার মেয়ে যাতে সত্যিকারের সুখী হয় সেই ব্যবস্থাই আমি করছি। একটি ভাল ছেলের সন্ধান পেয়েছি। সরকারী চাকুরে। মাস গেলে করকরে সাড়ে আটশো টাকা মাইনে। থাকে দিল্লীতে। কথাবার্তাও প্রায় পাকা। আর মাসকয়েক বাদেই কলকাতায় ফিরবে। তখনই শুভ-কাজটা সেরে ফেলব বলে ঠিক করেছি।

—সে তুমি যা ভাল বোঝ, কর। কিন্তু এদিকে সংসারের যা অবস্থা, তাতে চোখ বুজে থাকলে কি করে চলে! সাত মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি। ছেলেটাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—

—সবই বুঝি বড়বৌ, সবই বুঝি। চেষ্টা তো আর কম করছি নে, কিন্তু কিছুতেই যে কিছু হচ্ছে না। কি যে শেষ পর্যন্ত হবে, ঠাকুরই জানেন।

বাদে

—তাই তো খুকি সিনেমায় নামতে চাইছে। নইলে খুকি মার তেমন মেয়েই নয়। তুমি দেখে নিও।

—বেশ, তোমারও যখন তাই ইচ্ছে, তখন যা ভাল বোঝ, কর। তবে আমাকে যেন এসবেব মধ্যে জড়াতে চেয়ো না। দত্ত-বংশের ছেলে হয়ে ও-টাকা আমি জীবনে কোনদিন স্পর্শ করতে পারব না, এই তোমাকে বলে দিলাম।

—এই টাকাটা তুলে রাখ। মোট পাঁচ হাজাব রয়েছে।

—না না, আমাকে নয় বড়বৌ, আমাকে নয়। ওসব যা করবার তুমিই কব।

—ঠিক আছে, আমিই কবব। তুমি এখন তুলে রাখ।

—বেশ, বলছ যখন, রাখছি। তবে আমাকে যেন এসবেব মধ্যে টেনে এনো না। সে যাকগে। এ ছবিটাতে সাত হাজাব টাকার কণ্ট্রাক্ট হয়েছে বলে শুনেছি। আব দু' হাজার টাকা কোথায় গেল?

—খুকিকে কতগুলো জামা-কাপড় কিনতে হয়েছে, তাই। হাজার হোক, মেয়েছেলে। দশজনেব মাঝে যেতে হলে একটু ভাল জামা-কাপড় না হলে চলবে কেন?

—সে তো ঠিকই। তবে এজন্য বাজে খবচ না কবে শুটিংয়ের সময় যেগুলো পরে, ওগুলো নিয়ে এলেই তো পারে।

—ওমা! ও তো প্রোডিউসারের জিনিস। ওগুলো ও আনবে কি করে?

—বুদ্ধি থাকলেই আনতে পারে। এমন কতজনই তো আনে বলে শুনতে পাই। সে যাকগে। কাল রাস্তার একটা ব্যানারে তোমার মেয়ের ছবি দেখলাম। অমন জড়সড় ভাব কেন? পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে একটু ফ্রি হতে বলবে। নইলে উন্নতি হবে কি করে?

—সে যা হয় আমি বলব। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। হ্যাগা, তুমি যে দিল্লীর একটি ভাল ছেলের কথা বলেছিলে, তার কি হল? ঠাকুরের ইচ্ছায় খুকির কল্যাণে হাতে এখন হাজার ত্রিশেক টাকা জমেছে। আর দেরি করে লাভ কি! হাজার হোক, সোমত্ত মেয়ে। ওরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে।

—ওসব বাজে কথা এখন তুমি ভাবতে যেও না বড়বৌ। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ওসব দুদিন পরে হলেও এমন কোন ক্ষতি হবে না।

—একটা কথা বলব তোমাকে। কাল খুকির সঙ্গে অরুণ বলে একটি ছেলে এসেছিল। যাকে বলে হীরেব টুকরো ছেলে। দেখে মনে হল, ওদের মনেব মিলও খুব। আমার কিন্তু ছেলেটিকে দেখে খুবই পছন্দ হয়েছে।

—কি বললে? পছন্দ! না না, ওসব পছন্দ-টছন্দ এখন চলবে না। এই তো হল ওর উন্নতির সময়। এখন মন দিয়ে কাজ করতে হবে, সব কিছু শিখতে হবে, তবেই না! অভিনয় কি চাট্টিখানি কথা! এটা হল ইয়ে...মানে...মানে দস্তুরমত একটা আর্ট। এসব ফ্যাকড়া-ট্যাকড়া জুটলে এখন চলবে কেন? না না, তুমি এসব আজে-বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে খুকিকে মানা করে দিও। হাজার হোক, শিমুলতলাব দত্ত-বংশের মেয়ে। একথা যেন সে ভুলে না যায়।

—এই নাও দশ হাজার টাকা।

—দশ হাজার কেন? এখন রেট-টেটগুলো একটু বাড়াতে বল। আর কিছু না হোক, ছবি পিছু অন্তত হাজার চল্লিশেক না হলে পোষাবে কি করে! আর হ্যাঁ, অর্ধেক টাকা ব্ল্যাক-এ নিতে বলে দাও। ইনকাম ট্যাক্সের দিকটাও দেখতে হবে তো। ঝামেলা তো আর কম নয়!

—এটকা কথা বলব ?

—ভনিতা না করে বলে ফেললেই তো হয় !

—বলছিলাম যে···খুকি···খুকি···

—খুকি ! কি করেছে খুকি ?

—বিয়ে করেছে। ঐ অরুণকেই।

—বিয়ে ! খুকি বিয়ে করেছে ! এতবড় কথা ! এতখানি সাহস তার ! বলে দাও, ঐ কালামুখ যেন এ বাড়িতে আর কোনদিন সে দেখাতে না আসে। আমি তার মুখদর্শনও করতে চাই নে।

—কেন, এমন কি অন্যায় করেছে, শুনি ! বয়েসের মেয়ে। ওর যে একটু সাধ-আহ্লাদ আছে, সেকথা ভেবে দেখেছ কোনদিন ?

—থাম ! যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এস না। বেইমান ! নেমকহারাম ! এইজন্যেই কিনা তোকে অ্যাদ্দিন খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছিলাম ! বাপ-মাকে পথে বসিয়ে তোর বিয়ে করাটাই কিনা বড় হল ? তাও কিনা বংশমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কোথাকার কোন্ একটা হা-ঘরের ছেলেকে !

—কক্ষণো সে হা-ঘরের ছেলে নয়। তুমি যেমন শিমুলতলার দত্ত, সে-ও তেমনি ময়নাডাঙার চৌধুরী। তোমাদের দত্ত-বংশের চাইতে তারা কোনদিক থেকে ছোট নয়।

—ধ্যাত্তেরি তোর দত্ত-বংশের নিকুচি করেছে ! মাস মাস কতগুলো করে টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল সে খেয়াল আছে ? উঃ ! একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়লে হারামজাদী !

মাঘ, ১৯৬৮।

ঠিক করেছি, এবার একটা মজার ফিচার লিখব। যাকে বলে দারুণ ফিচার।

কিন্তু কি লিখব? কার সম্বন্ধে লিখব? কিছুই যে মনে আসছে না ছাই। কিন্তু সেকথা বললে চলবে কেন? যা হোক, কিছু একটা যে লিখতেই হবে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অধুনা শহীদদের নিয়ে বেশ লেখালেখি শুরু হয়েছে। তাদের কারো সম্বন্ধে লিখলে কেমন হয়?

উঁহু, সুবিধে হবে না। শহীদদের সংজ্ঞা এখন পালটে গেছে। এতকাল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে গিয়ে যাঁরা ফাঁসি-মঞ্চে বা কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরই একমাত্র শহীদ বলে জানতাম, এখন দেখছি গাড়ি চাপা মরলেও শহীদ হতে কোন বাধা নেই। এ অবস্থায় কি লাভ এসব বিতর্কমূলক ব্যাপারে মাথা গলিয়ে?

তাহলে কার সম্বন্ধে লেখা যায়? কোন নামী খেলোয়াড়কে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? না, তাও খুব একটা সুবিধে হবে না। ভাল খেললে মাথায় তুলে নাচবে, না-পারলে সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে মিথ্যে সম্বোধনে আপ্যায়িত করবে, এই তো খেলোয়াড়ের জীবন। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে লিখলে তা সবার কাছে খুব একটা উল্লেখযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

তাহলে কি করা যায় এখন? কার সম্বন্ধে লেখা যায়? জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চাটুজ্যে বা আচার্য সত্যেন বোসকে নিয়ে কিছু লেখা যায় কি? উঁহু, না-পড়েই পাতা উল্টে ফেলবে। কে চায় ওসব মোটা মোটা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে? সময় কোথায়? তাছাড়া বেজায় শক্ত। সুতরাং বাতিল।

আচ্ছা, রোন্‌টি-বিজয়িনীদের সম্বন্ধে কিছু লিখলে কেমন হয়?

উঁহু, চলবে না। আসল হিরোইনদের কথা কে আর জানতে চায় এযুগে? ক'জনই বা জানে তাদের নাম? সুতরাং যতই ধানাই-পানাই করি নে কেন, শেষ পর্যন্ত আমাকে লিখতে হবে চিত্র-জগতেরই এমন কোন লালা-ঝরানো হিরোইনের কথা, যিনি এ যুগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে ধ্যান-জ্ঞান-জপমন্ত্র বলে স্বীকৃত।

কথাটা মোটেই অত্যুক্তি নয়। আমাদের পাড়ার মেন্তির কথাই ধরুন। মেন্তি নাকি কি একটা ছবিতে সাইড রোল করছে। এখনো সে ছবি রিলিজ হয়নি। তা না হোক, তবু এরই মধ্যেই জাতীয়তা-বাদী কাগজগুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেন্তিকে নিয়ে সে কি তুমুল আলোড়ন!

পাতায় পাতায় শুধু মেন্তি—মেন্তি—আর মেন্তি! শুধু ছবি—ছবি—আর ছবি! মেন্তি কি খেতে ভালবাসে, তার জীবনের লক্ষ্য কি—এমনি কত সব কথা। কত মন-মাতানো কাহিনী। আর সে কি তার ভাষা! যেন দেবলোকের কোন শাপভ্রষ্টা অপ্সরা নেহাত আমাদের উদ্ধার করার জন্য দয়া করে মর্ত্যধামে নেমে এসেছেন আর কি।

শুধু কি তাই! এরই মধ্যেই মেন্তি বার-তিনেক ঘুরে এসেছে বিদেশ থেকে। না, বৈদেশিক মুদ্রার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। উচ্চ-শিক্ষার ব্যাপারে হাজার বিধি-নিষেধ থাকলেও এসব ব্যাপারে আমাদের জনপ্রিয় সরকার সত্যিই খুব উদার। সুতরাং লেখক হিসেবে বৈতরণী পার হতে গেলে আজ এ হেন মেন্তিদের লেজ ধরা ছাড়া উপায় কি বলুন? আফটার অল, জাতে তো উঠতে হবে!

কিন্তু না, সেখানেও বিপদ। কোথায় মেন্তির মত অমন গ্ল্যামার-ভরা চিত্র-তারকা? কেউ নেই। তারকা, উপতারকা, আধা-তারকা, সিকি-তারকা, কারো সম্বন্ধেই কাঁদুনী গাইতে বাকি নেই। এমন কি, হবু তারকাদের লিস্ট পর্যন্ত কমপ্লিট। এ অবস্থায় আমি কোথায়

পাব-তেমন চিত্র-তারকা, যার কথা ছেলে-বুড়ো সবাই গোগ্রাসে গিলবে নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে গিয়ে ? অর্ডার দিয়ে তো আর তৈরি করতে পারব না !

এখন উপায় ! কি লিখব তাহলে ? কার কথা ? দি আইডিয়া ! ওসব ঝুট-ঝামেলা বাদ দিয়ে নিজের সম্বন্ধে লিখলে কেমন হয় ? সহকর্মীরা স্বীকার করুক আর নাই করুক, অ্যাজ এ বহুরূপী, মার্কেটে দস্তুরমত আমার একটা বক্স-অফিস দাঁড়িয়ে গেছে। সেদিক থেকে জিনিসটা কম উপভোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া পাঠক-পাঠিকাদের দিকটাও একটু কনসিডার করা উচিত। বহুরূপীর আড়ালে আমি কে, তাই নিয়ে তাদের কত গবেষণা, কত চ্যালেঞ্জ ! কত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। কি লাভ দিনের পর দিন তাকে প্রশ্রয় দিয়ে ! তার চাইতে নিজের আসল পরিচয়টা এবার দিয়েই ফেলি। হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু, প্রশ্ন ? প্রশ্ন করবে কে ? বহুরূপী তো আর একালের কোন কাব্য-পটিয়সী চিত্র-নায়িকা নয় যে, সাংবাদিকের দল খাতা-পেন্সিল নিয়ে হে-হে করতে করতে ছুটে আসবে ! তেমন কপাল আর আমার হল কোথায় !

কোই বাত নেহি। না এল তো বয়েই গেল। তারকাদের মত নিজেই আমি ডবল রোল করব। অর্থাৎ, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করব, তারপর বহুরূপী সেজে নিজেই আবার সে প্রশ্নের জবাব দেব। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল। যাক, এবার শুরু করি।

প্রশ্ন : আপনি ছদ্মনামে লিখে থাকেন কেন ?

উত্তর : প্যাঁদানীর ভয়ে।

—বর্তমানে আপনার বয়েস কত ?

—বাহাত্তর।

—এত নাম থাকতে 'বহুরূপী' নাম নিলেন কেন ?

—কারণ, নিজেকে আমি জাতির প্রতীক বলে মনে করি।

আজকের দিনে কে বহুরূপী নয়? কে বলতে পারে যে, কথায় ও কাজে সে এক, ও অভিন্ন? কে বলতে পারে যে, বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে মিথ্যে ও অন্যায়ের সঙ্গে তাকে আপস করে চলতে হয় না? ব্যতিক্রম হিসেবে দেখাতে পারেন কি দু'একজনকেও?

—কি খেতে আপনি সবচাইতে বেশি ভালবাসেন?

—ঘুষ খেতে।

—অবসর সময় কি করে কাটান?

—পার্কে ঘুমিয়ে। ঐ মুখের সামনে একদণ্ড শান্তিতে থাকবার যো আছে নাকি!

—শুনেছি আপনি নাকি চব্বিশটি বালবাচ্চার পিতা। এ অবস্থায় আপনার পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয় কি?

—নেভার। কক্ষণো না। কিছুতেই না। বরং এটাকে আমি একটা জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি।

—একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

—এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে! পরিবার-পরিকল্পনা দেশের মাইনরিটি সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি, করেছে মেজরিটি সম্প্রদায়। পরিণামে আগামী পনেরো-বিশ বছরের মধ্যেই তারা মাইনরিটি হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে, আবার ভারত-বিভাগ। সেই চরম দুর্যোগ থেকে দেশকে আমি রক্ষা করতে চাই।

—আপনার বিশেষ হবি কি?

—ঘন ঘন ডিগবাজী খাওয়া।

—তাতে কিছু লাভ হয় কি?

—তবে কি মাগনা নাকি?

—লেখক-লেখিকাদের মধ্যে কার লেখা আপনার সবচাইতে বেশি ভাল লাগে?

—নিজের লেখা।

—তাহলে পাঠক-পাঠিকারা এত করে বলা সত্ত্বেও আর কোন উপন্যাস লিখছেন না কেন?

—রবীন্দ্র-পুরস্কার পাবার ভয়ে।

—কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

—এম. এ. পাস করেছি।

—সার্টিফিকেটটা দেখাবেন কি?

—আব্দার আর কি! ওসব হবে-টবে না, তা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

—কি মুশকিল! তাহলে আমি লিখব কি করে?

—ওরে আমার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এয়েছেন রে! কেন, অমুক দেবী ব্যারিস্টারী পাস করেছেন, তমুক দেবী প্রেসিডেন্ট জনসন-এর সঙ্গে খানা খেয়েছেন, এসব কথা লেখেননি আপনি? ক'টা ক্ষেত্রে তার সত্যতা যাচাই করে দেখেছিলেন, শুনি?

—মাফ করবেন, আপনার পরিচিতি লেখা আমার কম্মো নয়। আমি যাচ্ছি···

—যাচ্ছি মানে! গিয়ে দেখুন না একবার! ঠেংড়ি খুলে নেব না!

—এসব কথা কি বলছেন আপনি!

—আহা, একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা আর কি কেন, দিনের পর দিন এজন্য আপনাকে তোয়াজ করিনি? চা খাওয়াইনি? মাগনা নাকি। ওসব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়ব না আজ! সুতরাং ভাল চান তো ওসব ধানাই-পানাই ছেড়ে দিয়ে যা বলছি লিখুন ··

—কি করে তা সম্ভব? আমি খুব ভাল করেই জানি যে, এম. এ. পাস তো দূরের কথা, কলেজের ত্রি-সীমানায়ও আপনি কোনদিন যাননি।

—যাইনি তো কি হয়েছে? ওটা চেপে যান।

—চেপে যাব? বলেন কি!

—কেন, চেপে যাননি? জেনে-শুনেও অনেক কিছুই চেপে যাননি আপনি? দেব নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙে?

—থাক থাক, আপনাকে আর ঝামেলা করতে হবে না। আমি চেপেই গেলাম। এবার বলুন, কোন্ সালে আপনি পাস করেছেন?

—কোন্ সালে? ওটা—ওটাও চেপে যেতে হবে।

—বেশ, গেলাম। এবার বলুন যে, পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় আপনি এভাবে ভড়কি দেন কেন?

—দেশের মঙ্গলের জন্য।

—দেশের মঙ্গলের জন্য! তার মানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাই এখনকার দস্তুর। চোর-চোট্টা, নেতা, উপনেতা সবার মুখেই এখন এক রা, যা করেছি, সবই দেশের মঙ্গলের জন্য। তাহলে আমিই বা বাদ যাই কেন, বলুন?

—লোকে বলে বহুরূপী নাকি বাংলা দেশের ভড়কিবাজ দি গ্রেট। এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

—ঠিকই বলে। এ ব্যাপারে আমার কাছে বাদবাকি সবাইকে আমি নেহাত দুগ্ধপোষ্য শিশু বলেই মনে করি।

—ধন্যবাদ। শুভ নববর্ষে আপনার ভড়কির কিছু স্যাম্পেল দেবেন কি?

—মানে! এতক্ষণ তাহলে কি দিলাম?

বৈশাখ, ১৯৬৮।

ওদের চিনে রাখুন।

না না, ডান বা বামপন্থীদের কথা বলছি নে। কংগ্রেস বা বাংলা কংগ্রেসের কথাও নয়। আমি বলছি আমার প্রকাশক মানিক

বিশ্বাস এ্যাণ্ড কোং এর কথা। চিনে রাখুন এদের ভাল করে। নইলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে।

আমি মশাই ভাল লোক, কারো সাতে-পাঁচে থাকি নে, আমাকে বলে কিনা, আপনাকে ভোটে দাঁড়াতে হবে।

শুনে আমি তাজ্জব। বলে কি! পাড়ায় এত সব রথী-মহারথীরা থাকতে ভোটে দাঁড়াব কিনা আমি! আর তাদের উদ্যোগ-আয়োজনই বা কত! এই ছিদামবাবুর কথাই ধরুন। ভদ্রলোক একধারসে টেস্ট ক্রিকেটের টিকেট বিলিয়েছেন। বগলাপ্রসাদ প্রতিটি ক্লাবের ঠাকুর তৈরি করে দিয়েছেন। ভাসান দেবার খরচ জুগিয়েছেন দোলগোবিন্দবাবু নিজেই। তাদের হটিয়ে ভোটে দাঁড়ানো কি চাট্টিখানি কথা!

—ভুল ধারণা। যুক্তি দেখালেন মানিকবাবু, অ্যাজ এ বহুরূপী আজ আপনার গ্ল্যামার যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একবার দাঁড়িয়ে যান, তারপর দেখুন যে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস খেয়ে গেলাম। মন্দ কি! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে! এমন কি শক্ত কাজ! কাজের মধ্যে তো বিধানসভায় গিয়ে মাঝে মাঝে হাত তোলা, আর প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে খিস্তি-খেউড় করা। তা, ওটা আমি দশজনের আশীর্বাদে ভালই পারব আশা করি। তবে পয়লা ধাক্কাটা সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। ক্যাশ-কড়ি চাই। লোকবল চাই। ওয়ার্কার চাই।

—ওয়ার্কারের জন্য ভাববেন না। অভয় দিলেন মানিক বিশ্বাস, দাঁড়িয়ে যান, তারপর দেখবেন যে, নিজে থেকেই এসে ওরা জুটে গেছে। বলেন তো আমরাই না হয় সে-সব ব্যবস্থা করে দেব।

—আজ থাক ভাই। একটু ভেবে দেখি। তারপর যা হয় কাল বলব।

কি বলব দাদা, সারারাত সেদিন ঘুম হল না। খালি চিন্তা, আর

চিন্তা। দোলগোবিন্দবাবু এই করে গত পাঁচ বছরে পাড়ায় তিনখানা বাড়ি হাঁকিয়েছেন। চেষ্টা করলে আমিই কি তা পারব না। আলবৎ পারব। বছরে একখানা করে পারব। তাহলে আর দেরি করে লাভ কি। এখন থেকেই উঠে-পড়ে লাগা যাক।

তবে একটা দলীয় টিকেট পেলে বড় ভাল হত। কাদের টিকেট পাওয়া যায়। কংগ্রেসের। উঁহু, অসম্ভব। কিছুতেই দেবে না। তবে কি বিপক্ষ দলের। উঁহু, সেখানেও সুবিধে হবে না। কাজ বাগানোর পরে ডিগবাজী খেতে দেখে ওরাও এখন হুঁশিয়ার হয়ে গেছে।

বাকি রইল নির্দলীয়। তা নির্দলীয়ই বা মন্দ কি? বরং একদিক থেকে সে ভাগ্যবান। আর যাই হোক, কোন তরফ থেকে তাকে খিস্তি-খেউড় শুনতে হয় না। তাছাড়া আরো লাভ আছে। তেমন বেকায়দা দেখলে কিছু মালকড়ি ট্যাঁকস্থ করে কারো তরফে বসে পড়তে তার কোন অসুবিধে নেই। সুতরাং নির্দলীয়ই ফাইনাল।

মানিক বিশ্বাসের কথা মিথ্যে হল না। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে পাড়ার মস্তান ন্যাড়া মিত্তির এসে হাজির। —কি বলবেন, ঝটপট বলে ফেলুন স্যার। হাতে একদম টাইম নেই।

একগাল হেসে গদগদ কণ্ঠে বললাম, সবই তো শুনেছ। তোমরাই হলে দেশের আশা-ভরসা। এখন সবাই মিলে যদি একটু খেটে-খুটে...

—কেটে পড়ুন স্যার, কেটে পড়ুন। ন্যাড়া মিত্তিরের সাফ জবাব, কেন শুধু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবেন? তাছাড়া আমাদের টাইম নেই। অলরেডি তিনটে পার্টির কাজ হাতে নিয়েছি।

তিনটে পার্টি। আমি অবাক। তার মানে।

—কেন, অসুবিধের কি আছে? ন্যাড়া মিত্তির নির্বিকার, সকাল

ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ভোট ফর—ছিদামবাবু। বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা—দোলগোবিন্দবাবু। আবার ছ'টা থেকে রাত বারোটা—বগলাপ্রসাদ। এরপর আর টাইম কোথায়, বলুন ?

—এই ব্যাপার! হতাশভাবে বললাম, তাহলে আমার আর হল না। এতকাল বহুরূপী সেজে তোমাদের সেবা করেছি। বড় আশা ছিল···

—বহুরূপী! ন্যাড়া মিত্তির ট্যারা, আ-আ-আপনি বহুরূপী! এতক্ষণ বলেননি কেন ? দিন দাদা, পায়ের ধুলো দিন। গুরুদেব মানুষ আপনি। আপনার পায়ের ধুলো নিলেও পুণ্য হয়। ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি। ওভার-টাইম খেটে করে দেব আপনার কাজ। রাত বারোটা থেকে ভোর ছ'টা।

—সেকি! অবাক হয়ে বললাম, ও সময় তো সবাই ঘুমিয়ে থাকবে। স্লোগান-ফ্লোগানগুলো হয়তো কেউ শুনতেই পাবে না।

—ওসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ন্যাড়া মিত্তির নির্বিকার, গুরুদেব বলে যখন একবার ডেকেছি, তখন জেনে রাখুন যে, আপনার উইন এবার কোন বান্দাই ঠেকাতে পারবে না। ন্যাড়া মিত্তিরের ওয়ার্ড ইজ অনার। বিশ্বাস না হয় তো সাড়ে তিন মাইলের মধ্যে যে-কাউকে নামটা একবার বলে দেখবেন।

—তা না হয় হল। বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু পোস্টার-টোস্টার-গুলো ছাপানোর ব্যবস্থা···

—গুলি মারুন পোস্টারে! শুধু বড় বড় অক্ষরে আপনার 'বহুরূপী' নামটা একবার ছাপিয়ে দিন, তারপর যা করার আমরাই করব। ভাবছেন কেন অত ? দরকার হলে ফল্‌স্ মেরে ঠিক ম্যানেজ করে দেব। এবার ঝটপট নামটা ছাপিয়ে দিন।

—বেশ, তাই দেব। তবে সবই তো বুঝতে পারছ ভাই। পেছনে তো আমার পার্টির কোন টাকা নেই, তাই খরচ-পত্রটা একটু···

—কোই বাত নেহি। সবাই জানে আপনি হক্ কথার মানুষ। তাই এখন শুধু নাম সই করে স্লিপ কেটে যান। তারপর দাঁড়িয়ে গেলে আর ভাবনা কি! ও তো একমাসের মধ্যেই উঠে আসবে। যাক, এখন আমি উঠি। বিকেল পাঁচটায় দোলগোবিন্দবাবুর মিটিং। লোক জড় করতে হবে, আবার ঠিক ছ'টায় বোমা ছুঁড়ে ঐ মিটিং ভেঙে দিতে হবে।

—সোক! আমি অবাক। একি কাণ্ড! মিটিংয়ে লোক জড় করে আবার তা বোমা মেরে ভেঙে দিতে হবে কেন?

—কেন ছলনা করছেন গুরু? আপনি তো সবই বোঝেন। ডিউটি ইজ ডিউটি। ছ'টা পর্যন্ত দোলগোবিন্দবাবুর টাইম। তার-পরের পালা বগলাপ্রসাদের। তার দিকটাও দেখতে হবে তো! ন্যাড়া মিত্তিরের ওয়ার্ড ইজ অনার। তার কাজে কোনরকম গাফিলতি পাবেন না।

—তা না হয় মানলাম, কিন্তু আমার দিকটা···

—বলছি তো, আপনাকে এবার রুখনেওয়ালা কোই নেহি। ন্যাড়া মিত্তিরের ওয়ার্ড ইজ অনার। বিশ্বাস না হয় তো কাজেই দেখে নেবেন।

—কি করে? ফস করে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

—স্রেফ ভড়কি দিয়ে। ভড়কি যে কি চীজ সে তো আপনার ভাল করেই জানা আছে গুরু। আঃ! মাঝে মাঝে যা ছাড়েন এক একখানা! একেবারে কড়া।

ধন্য ন্যাড়া মিত্তির। ধন্য তার প্রতিভা। ভড়কিই সে দেখাল বটে। পথে-ঘাটে এখানে-ওখানে যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বহুরূপী আর বহুরূপী। কংগ্রেস-প্রার্থী বহুরূপীকে ভোট দিন। বামপন্থী বহুরূপী আপনাদের ভোট-প্রার্থী। কমিউনিস্ট-সমর্থিত বহুরূপী আপনাদের ভোট প্রার্থনা করেন। নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে যিনি ভোট প্রার্থনা করছেন, তিনিও বহুরূপী। অর্থাৎ, সর্বদল সমর্থিত

একটিই মাত্র প্রার্থী এ অঞ্চলে দাঁড়িয়েছেন, তিনি স্বয়ং বহুরূপী ছাড়া আর কেউ নন। না, এজন্য ন্যাড়া মিত্তিরকে কোন পোস্টার ছাপাতে হয়নি। বিভিন্ন প্রার্থীর নামের ওপর বহুরূপী নামটা এঁটে দিয়েই সে বাজীমাৎ করে দিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। প্রতিশ্রুতিমত রাত বারোটার পর টিনের চোঙ মুখে দিয়ে শুরু হল তার নির্বাচনী-প্রচার। সেখানেও ন্যাড়া মিত্তিরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

'বন্ধুগণ, যে যাই বলুক না কেন, আজকের দিনে সত্যিকাবের বাস্তবধর্মী বলে যদি কেউ থাকেন তো তিনি হলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য পুরুষ বহুরূপী। আপনারা জানেন যে, এ যুগটাই হল কাঁচির যুগ। কি সরকার, কি ব্যবসায়ী, কি দোকানদার, যে যেখানে সুবিধে পাচ্ছে, পাবলিকের পকেটে কাঁচি চালাচ্ছে। তাই বহুরূপী তার সিম্বল নিয়েছেন কাঁচি। বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপাবে তিনি গুরুদেব মানুষ। শুধু পকেট কাটতে নয়, পরের নাক কাটতে, কান কাটতে বর্তমানে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেই চলে। তাছাড়া ভড়কি দিতে সারা বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমানে তাঁর সমকক্ষ যে একটিও নেই, সেকথা বোধহয় আপনারাও স্বীকার করবেন। তাই সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা সবাই কাঁচি মার্কা চিহ্নে ভোট দিয়ে তাঁকে জয়যুক্ত করুন।'

নরম সুর শেষ হল। ক'দিন বাদেই শুরু হল গরম সুর। তখন প্রায় শেষ রাত্রি। সবাই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ সমস্বরে শোনা গেল, বল হরি, হরিবোল! বল হরি, হরিবোল!

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল সবাই। কি ব্যাপার! এই শীতের রাত্রে কে গেল!

—কেউ যায়নি এখনো। চোঙা মুখে দিয়ে নিচ থেকে জবাব দিল ন্যাড়া মিত্তির, তবে এবার যাবে। বল ভাই সব, বল হরি, হরিবোল!

—আঃ! কি হচ্ছে এসব? কে একজন ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করতে-চেষ্টা করল, ঘুমোতেও দেবে না নাকি তোমরা?

—কেন দেব না? জবান্ দাও যে, বহুরূপীকে ভোট দেবে ব্যস, এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। নইলে সারা রাত, সারা মাস, সারা বছর ধরে এই চলবে। আমার নাম হ্যাড়া মিত্তির। পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভ হবে না। সব ব্যবস্থা আছে।

সত্যিই বাজীমাৎ করে দিল হ্যাড়া মিত্তির। কংগ্রেস, ডান, বাম সবার জামানত জব্দ। আঃ! কি বুদ্ধিই দিয়েছিল প্রকাশক মানিক বিশ্বাস! এখন আর আমাকে পায় কে?

পরের দৃশ্য—মিছিল। ফুলের মালা গলায় দিয়ে গাড়ির একপাশে আমি, অন্য পাশে আমার হোমগার্ড, হার হাইনেস দি গ্রেট পদির মা। জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে সে কি তার একগাল হাসি! দেখে কে বলবে যে, ঐ হাত দিয়ে গতকালও সে গুনে গুনে আড়াই হাজার ঘুঁটে দিয়েছিল!

মিছিলের পরে শুরু হল অভিনন্দনের পালা। প্রথমেই এলেন পাড়ার মুকুন্দবাবু। তিনি নাকি আমার সাপোর্টার। সুতরাং তাঁর ছোট্ট দাবি, এবার তাঁর অপোগণ্ড ছেলেটার যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দীননাথবাবুর অনূঢ়া কন্যাটির জন্য একটি সুপাত্র জুটিয়ে দেবার দায়ও আমার। কারণ, তিনিও আমার সাপোর্টার। ঘোষালগিন্নীর দাবিটা অবশ্য খুবই কম। অবিলম্বে তাঁকে একটি ঠিকা ঝি জুটিয়ে দিতে পারলেই তিনি খুশি।

এরপর এলেন রকেট্ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। তারা নাকি আমার হয়ে খুব খেটেছে। সুতরাং তাদের ক্লাবে এককালীন হাজার দুয়েক চাঁদা দেয়া আমার অবশ্যকর্তব্য। পাড়ার অল বেঙ্গল কীর্তনীয়া সমাজও বাদ গেল না। তাদের একসেট্ নতুন খোল-করতাল কিনে না দিলেই নয়। আর বয়েজ ক্লাবের তো কথাই নেই। ফুটবল ও ক্রিকেটের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদের এক্ষুণি চাই।

এখানেই শেষ নয়। রাত দুপুরে শুরু হল ন্যাড়া মিত্তিরের চিৎকার আর চেঁচামেচি। —শিগ্‌গীর একবার বেরিয়ে আসুন গুরু। এক্ষুণি একবার থানায় যেতে হবে।

—থানায়! আমি অবাক। কি ব্যাপার! থানায় কেন?

—দেখুন দেখি কাণ্ড! রাশি রাশি ক্ষোভ ঝরে পড়ল ন্যাড়া মিত্তিরের কণ্ঠে, মাল খেয়ে রাস্তায় স্লাইট একটু হুজ্জতি করেছে বলে ভল্টেকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। কি অন্যায় কথা বলুন দেখি! এর কোন মানে হয়! আর কাকে কি বলব! যেমন আমাদের গরমেণ্ট, তেমনি হয়েছে পুলিশ। সব সমান।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। না গিয়ে উপায় কি! হুজ্জতি করুক, আর যাই করুক, ভল্টে আমার সাপোর্টার। সুতরাং যেতে আমি বাধ্য। পাঁচ বছর পরের কথাটাও ভাবতে হবে তো!

ভাবতে হবে মদনার ছোট্ট দাবিটির কথাও। যদিও ভ্যানতারা করার অপরাধে ইতিমধ্যেই সে বারকয়েক চেঞ্জ থেকে ঘুরে এসেছে, তবু জেনে-শুনেই চাকরির প্রয়োজনে আমি তাকে একটি ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য। কারণ, একে সে আমার সাপোর্টার, তদুপরি একই পাড়ায় থাকি। রাত-বিরেতে পথ চলার কথাটা না ভাবলে চলবে কেন?

এরপর এল বিল পরিশোধ করার পালা। শুধু বিল আর বিল! হাজার হাজার বিল। হারুদার চায়ের দোকানে, সাড়ে সাত হাজার টাকা। পাঞ্জাবী হোটেল, তেরো হাজার। পান-সিগারেট, সাড়ে চার। সিনেমা, পাঁচ হাজার। জলসা, এগারো হাজার। প্রেস, সাত। মাইক, চার। ট্যাক্সি ও রিক্সা, নয়। ফুল ও ডেকরেটিং, আট। অন্যান্য খাইখরচ, বত্রিশ হাজার।

—অন্যান্য খাইখরচ মানে? ভয়ে ভয়ে তাকালাম ন্যাড়া মিত্তিরের দিকে।

—ওসব জানতে চাইবেন না গুরু। লজ্জা পেয়ে বললবে

মিত্তির, যা শীত। একটু গরম না হলে ওভারটাইম ডিউটি করা যায়? আপনিই বলুন না!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কি সর্বনাশ! ভাতা বাবদ পাঁচ বছরে পাব সর্বসাকুল্যে মোট পনেরো-বিশ হাজার টাকা, তার জন্য দিতে হবে কিনা গুনে গুনে মোট সাতানব্বই হাজার টাকা! এখন উপায়! কোথায় পাব আমি এত টাকা? উঃ! কি কুক্ষণেই না সেদিন অমন করে গ্যাস খেয়েছিলাম! ওদের পেটে যে এত কুবুদ্ধি ছিল, তা কে জানত!

—টাকাটা ফেলে দিন গুরু। বৈষ্ণবোচিত বিনয় ফুটে উঠল ন্যাড়া মিত্তিরের কণ্ঠে, ওরা বড্ড তাগাদা দিচ্ছে। এরপর একটা নালিশ-টালিশ ঠুকে দিলে কি ভাল দেখাবে। আফটার অল আপনি এখন একজন এম. এল. এ.। একটা ইজ্জত আছে তো! কথা যখন দিয়েছেন...

ত্যাত্তেরি তোর কথার নিকুচি কবেছে! মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললাম। ভোটের আগে কোন্ বান্দা না গালভরা কথা দিয়ে থাকে! তা বলে কাজ বাগানোর পরে কে আর সেকথা মনে রাখতে যায়! তাহলে আমারই বা এমন কি দায় পড়েছে যে, কথা রাখতে যাব!

বেশ জোর গলাতেই বললাম, না না, হবে না। কিচ্ছু হবে না। আমি পারব না। কোন লাভ নেই বলে।

এ্যাই! এ্যাই! বিরাট এক ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, সামনেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আমার হোমগার্ড হার হাইনেস দি গ্রেট পদির মা। মুহূর্তবাদেই আবার তিনি কণ্ঠে ঝঙ্কার তুললেন, মুখপোড়া মিন্সের কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। সেই কখন থেকে বলছি, ওগো, চাল বাড়ন্ত, বেলেক্ থেকে কিছু চাল এসো, তা বলে কিনা—পারব না! বলি, না পারলে এই রাবণের গাড়ি কাঁড়ি গিলবে কোথা থেকে, শুনি?

সম
না
ক্রি

বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। তাহলে সত্যিই আমি ভোটে দাঁড়াইনি! আসলে স্বপ্ন দেখছিলাম। যাক, বাঁচা গেল। মানিক বিশ্বাসের কথা শুনলেই হয়েছিল আর কি! এমন এম. এল. এ. হবার চাইতে বহুরূপী হওয়া ঢের ভাল।

ছবি করিবেন? শুভ সংবাদ। কি ছবি করিবেন? সামাজিক! ঐতিহাসিক! না পৌরাণিক!

না, কোনটাই চলিবে না। মনে রাখিবেন যে, যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। দর্শকগণও ভাল-মন্দ বুঝিতে শিখিয়াছে। এমন কি ছবির ট্রিট্‌মেণ্ট, ক্লাইমেক্স, সাসপেন্স পর্যন্ত তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং, যদি একই সঙ্গে সাপও মারিতে চান, অথচ লাঠিও বাঁচাইতে চান, তবে আপনাকে বাস্তবধর্মী ছবি করিতে হইবে। অর্থাৎ কিছু স্টাণ্ট ও কিছুটা ক্যামেরার খেল দেখাইয়া স্রেফ ভড়কি দিয়া কার্য উদ্ধার করিতে হইবে।

মনে রাখিবেন যে, এযুগে যাহা দুর্বোধ্য, তাহাই অসাধারণ। সুতরাং তেমন কিছু দেখিলে দর্শকগণও সঙ্গতি, অসঙ্গতি, কে, কি, কেন ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে সাহস পাইবে না। না বুঝিলেও বুঝি নাই বলিয়া স্বীকার করিবে না। অন্তত বোকা সাজিবার ভয়েও মুখ খুলিবে না। সুতরাং মাভৈঃ। সঙ্গে যদি 'কেবলমাত্র বুদ্ধিমানদের জন্য' বলিয়া একটা পাবলিসিটি দিতে পারেন তো চমৎকার! দেখিবেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমান সাজিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

নমুনা হিসাবে একটি বাস্তবধর্মী কাহিনীকে ছবিতে কিভাবে

বিন্যাস করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। বাস্তবধর্মী ছবি সাধারণত এ্যাক্শন-প্রধান। এ্যাক্শনগুলির অর্থও বুঝাইয়া দিতেছি।

গভীর অরণ্য। প্রিয় কুকুর টম্‌কে সঙ্গে লইয়া সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নায়ক বীরদর্পে আগাইয়া চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, বলিব না। কেন যাইতেছে, বলিব না (দেখুন কি সাসপেন্স)। সহসা ফটাস্ ফটাস্ করিয়া হাজার হাজার আতসবাজী ফাটিতে লাগিল। কি ব্যাপার ? না, কিছুই না। বাস্তবধর্মী ছবিতে ক্যামেরার কেরামতি দেখাইবার জন্য এইসব রাখিতে হয়।

হাঁটিতে হাঁটিতে নায়ক লেকের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপরীত দিক হইতে নায়িকাকে আসিতে দেখা গেল। তাহারও সঙ্গে একটি কুকুর, নাম সিলি (কুকুরের দিশি নাম থাকিতে নাই)।

(সিম্বলিক সট্) অদূরে দুইটি ষাঁড়কে গুঁতাগুঁতি করিতে দেখা গেল।

দেখাদেখি নায়ক-নায়িকাও একে অন্যকে গুঁতাইয়া দিল (গল্পের নায়ক-নায়িকাদের শিং থাকে)।

নায়ক ঃ আপনাকে দেখতে পাইনি। মাপ করবেন।

নায়িকা কোৎ. করিয়া হাসিল। ভাবটা এই যে, মর্ মিন্‌সে ! আমি কি তোকে মানা করেছি নাকি ?

নায়ক ঃ কি সুন্দর মিষ্টি হাওয়া বইছে দেখেছেন ! আসুন না এখানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক !

(সিম্বলিক সট্) নায়কের কুকুর টম্ ও নায়িকার কুকুব সিলি গাছতলায় গুটিসুটি হইয়া বসিল। অর্থাৎ, ইহারাই এখন নায়ক-নায়িকা।

টম্ সিলির পা চাটিতে লাগিল। অর্থাৎ, নায়ক নায়িকাকে তোয়াজ করিতে লাগিল।

সিলি কায়দা করিয়া হাসিল। অর্থাৎ, আমি আগেই জানতাম ! এর আগেও অনেকে আমার পা চেটে গেছে।

নায়ক রতিবিলাস ও নায়িকা মঞ্জরী উভয়েই বাস্তবধর্মী। উভয়েই সমান মিথ্যেবাদী। উভয়েই ইতিপূর্বে বহু ঘাটের জল ঘোলা করিয়াছে। উভয়েই ভাল-মন্দ দোষে-গুণে গড়া মানুষ। উভয়েই জানে যে, প্রেম করাই নায়ক-নায়িকার জীবনের একমাত্র ধর্ম।

রোমান্টিক সিন শুরু হইল।

রতি : সত্যি তুমি বড় লাভলি মঞ্জরী!

মঞ্জরী কোৎ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ, সবার মুখেই এক কথা।

রতি : অপূর্ব তোমার চোখ ছুটো!

মঞ্জরী আবার হাসিল। অর্থাৎ, কলেজে মিঃ আয়ার, মিঃ রায়, মিঃ আলী, সবাই একথা বলতো।

সহসা উতল বাতাসে মঞ্জরীর বুকের আঁচল খসিয়া পড়িল। আসলে গ্ল্যামার দেখাইবার জন্য মঞ্জরী নিজেই ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দিল। সে যুগে তেনারা লজ্জা পাইলেও এ যুগের এনাদের এ ব্যাপারে ভারি উৎসাহ। এনারা জানেন যে, জনপ্রিয়তার মূল উৎস কোথায়!

রতি : (মনে মনে) দেখতে তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে। বড়লোকের মেয়েই হবে হয়তো। বাগাতে পারলে কেমন হয়!

মঞ্জরী : (মনে মনে) মনে হয় বেশ হাই সোসাইটির ছেলে। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সও নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। দেখাই যাক না!

রতি : (প্রকাশ্যে) মঞ্জরী, এসো, তুমি আর আমি ছুজনে···

মঞ্জরী খ্যাক খ্যাক করিয়া হাসিল। অর্থাৎ, আমি কি না করেছি নাকি!

রতি : চলো, গাড়িতে একটু বেড়ানো যাক।

উভয়ে গাড়িতে উঠিল। (গাড়িটা এতক্ষণ নায়কের পকেটেই ছিল)

(সিম্বলিক সট্) আকাশে ছুইটি পাখি ক্রমাগত ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অর্থাৎ, নায়ক-নায়িকা চুটাইয়া প্রেম করিতে লাগিল।

সহসা মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হইয়া উঠিল। শুরু হইল প্রচণ্ড ঝড়। অর্থাৎ ক্লাইমেক্স আসন্ন। আচমকা উপনায়িকা রমলা আসিয়া হাজির হইল। রতিবিলাস অপ্রস্তুত।

রমলার দুই চোখে আগুন। অর্থাৎ, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে! এ জন্যই বুঝি ক'দিন দেখা পাইনি!

রতিঃ হে-হে-হে…না না,…মানে-মানে…তুমি একটু বসো মঞ্জরী, আমি রমলাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। হে-হে-হে… আমার অনেক কালের চেনা কিনা!

রতিবিলাস রমলাকে লইয়া অগ্রসর হইল। নেপথ্যে টুং টুং করিয়া গীটার বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জরী গান ধরিল। এ অবস্থায় গান ধরিতে হয় তাহা সে জানে।

পরদিন আবার দেখা হইতেই মঞ্জরী একেবারে ফোঁস্ করিয়া উঠিল, ঐ মেয়েটা কে, আমি জানতে চাই। আগে নিশ্চয় তুমি ওকে ভালবাসতে!

রতিঃ ছিঃ ছিঃ, কি যে বল! রমলা আমার দূরসম্পর্কের বোন হয়।

মঞ্জরীঃ বোন! নিজের বোনের দিকে ফিরে না তাকালেও পরের বোনদের ব্যাপারে তোমাদের নায়কদের উৎসাহটা যে একটু বেশি, তা আমার জানা আছে। কিন্তু কেন? কেন আমাকে এমন করে ঠকালে? আমি যে তোমাকে ছাড়া—উঃ! মঞ্জরী দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

পী-পী-পী। অদূরে একটা মোটর ব্রেক কষিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জরীর পাস্ট লাভার গদাই পালের কণ্ঠ শোনা গেল, আরে মঞ্জু যে! খুব বিজি আছ বলে মনে হচ্ছে! ঠিক আছে, আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

মঞ্জরীঃ কে? মিঃ পাল! প্লীজ, আমাকে এখান থেকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। এখানে আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারছি নে।

(সিম্বলিক সট্) আকাশে দুইটি পাখি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সহসা অন্য একটি পাখি দেখিয়া দল হইতে একটি পাখি তাহার দিকে ভিড়িয়া গেল। অর্থাৎ, উপযুক্ত শাঁসালো মক্কেল দেখিয়া বুদ্ধিমতী নায়িকা কাটিয়া পড়িল।

[ইণ্টারভ্যাল]

(ভুল বুঝিবেন না। গল্পের নায়িকা অসতী হয় না, তাহা আমি জানি। অসতী হইলে মহিলারা সে ছবি দেখিবেন না, তাহাও আমি জানি। সুতরাং এখন জল ঘোলা করিলেও যথাসময়ে আবার সে ফিরিয়া আসিবে, আবার প্রেমের পরকাষ্ঠা দেখাইয়া দর্শকদের বোকা বানাইয়া ছাড়িবে। ততক্ষণ ধৈর্য ধরুন।)

ইণ্টারভ্যালের পরে আবার গল্প শুরু হইল। নায়িকা চলিয়া যাইতেই নায়ক ভুল বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া 'মঞ্জরী প্রসূতি সদন' নাম দিয়া এক বিরাট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল (বোধহয় লটারীতে টাকা পাইয়াছিল)। কাগজে কাগজে সে খবর ফলাও করিয়া ছাপা হইল। দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিল।

গভীর রাত্রি। বোম্বাইয়ের একটি হোটেলের কক্ষে নায়িকা শুইয়া আছে। চোখে ঘুম নাই। কাগজে নায়কের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার খবর দেখিয়া অনুতাপে তার বুকটা পুড়িয়া যাইতেছে। মাতাল অবস্থায় ঘরে ঢুকিল উপনায়ক (অধুনা ভিলেন) গদাই পাল। দেখুন কি থ্রিল! কি ক্লাইমেক্সে গল্প উঠিয়াছে!

নাকিয়া ঃ এ কি। আপনি এত রাত্রে আমার ঘরে এসেছেন কেন?

গদাই ঃ কেন, আগে কি কোনদিনই আসিনি?

নায়িকা ঃ সে যাক্‌গে। আপনি এখন বেরিয়ে যাবেন কিনা বলুন! ছিঃ ছিঃ! চিরদিন আপনাকে দাদার মত দেখেছি।

গদাই ঃ দাদা! দাদা বলেই বুঝি সেবার আমার টাকায়

ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িটা কিনেছিলে? জুয়েলারী দোকানের বিলগুলি বরাবর আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে দাদা বলেই বুঝি? নিজের চার-চারটে দাদা রয়েছে, কই, তাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের দিকে তো নজর দিতে দেখিনি? নেহি মাংতা ওসব তত্ত্বকথা। কাম অন্…

এই সময়ে নায়ক আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলে গল্প আরো জমিয়া উঠিত, কিন্তু নায়িকার তাহাতে ভীষণ আপত্তি। সে একাই বীরত্ব দেখাইয়া হাততালি পাইতে চায়। অগত্যা তাহাই হইল। এ অবস্থায় অন্য দশটি নায়িকা যাহা করে, সে তাহাই করিল। অর্থাৎ, ফুলদানীর ঘায়ে মাতালটাকে আহত করিয়া বীরদর্পে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে নায়ক গুরুতর অসুস্থ (শেষ দৃশ্যে অসুস্থ হইতে হয়)। বিকারের ঘোরে অনবরত সে ডাকিতে লাগিল, মঞ্জরী—মঞ্জরী—

—রতিদা! রতিদা! একতলা হইতে ছুটিয়া নায়িকা উপরে উঠিতে লাগিল।

এইবার! এইবার! বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের সিটি দিবার সময় আসিয়াছে। যে স্বর্গীয় দৃশ্য পিতামাতা, পুত্রকন্যা, পাশাপাশি বসিয়া নির্বিকার চিত্তে উপভোগ করে, যে দৃশ্য দেখিবার জন্য পাঁচ হইতে শুরু করিয়া পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধের পর্যন্ত সমান উৎসাহ—সেই দৃশ্য আসিতেছে। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করিয়া যাঁহারা পরের লদ্‌কালদ্‌কি দেখিতে ভালবাসেন তাঁহারা তৎপর হউন।

নায়ক সচকিত। কার গলা শোনা গেল? কে? কে?

—রতিদা! রতিদা! আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকিল নায়িকা।

প্রেমের কি মহিমা! সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক (অসুস্থতা ভুলিয়া) তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই নায়কের বুকে মাথা রাখিয়া—থুড়ি, বাস্তবধর্মী ছবিতে উল্টোটা হয়। সুতরাং নায়িকার বুকে পূর্ণ আড়াই মিনিট ধরিয়া নায়ক তাহার মাথা ঘষিতে লাগিল…

দরজায় উঁকি দিয়া টম্ ও সিলি এ দৃশ্য দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অর্থাৎ, আদিরসের উদ্দামতায় কারা বেশি এ্যাডভান্স? আমরা, না ওরা?

সিনেমা জগৎ

'সত্যের জন্য সব কিছুই পরিত্যাগ করা চলে, কোন কিছুর জন্যই সত্যকে পরিত্যাগ করা চলে না।'

স্বামীজীর বাণী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ বাণী আপনারা পড়েছেন। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে বিরাট সাইনবোর্ডের গায়েও কথা-গুলো দেখে থাকবেন কেউ কেউ। ঠিক গান্ধীমূর্তির পাশেই। তাকালেই নজরে পড়বে।

সত্যিই অমূল্য বাণী। তাই যুগ যুগ কেটে গেছে, তবু এ বাণী আজো এতটুকু ম্লান হয়নি মানুষের মনে। কিন্তু…গোল বাধিয়েছে এই 'কিন্তু'টাই। স্বীকার করি যে, সত্যের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু সত্যের সংজ্ঞা কি? সত্যের সংজ্ঞা কি সবার কাছে এক? তাহলে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা সত্য নয়, কে তার বিচার করবে?

আমি যদি বলি যে, 'সংসারে এমন অনেক মিথ্যে আছে, যা সত্যের চাইতেও বড়', তাহলে সেটা কি ভুল হবে? চিকিৎসক কি কোনদিন কোন জননীকে বলবেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু আসন্ন? না কি মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন যে, 'না, ভয়ের কোন কারণ নেই। দেখা যাক, কি হয়!' কোন্‌টা তার কাছে সত্য? কোন্‌টা বাস্তব?

সত্যের দোহাই দিয়ে কোন বন্দী দায়িত্বপূর্ণ অফিসার কি

নিজের দেশের সমস্ত সামরিক তথ্য ফাঁস করে দেবেন শত্রুরাষ্ট্রের কাছে? না কি নানাভাবে তাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবেন মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে? কোন্‌টা তার কাছে সত্য? কোন্‌টা দেশদ্রোহিতা?

আইনজীবি কি কোর্টকে লক্ষ্য করে বলবেন যে, 'হুজুর, আমি জানি, আমার মক্কেলই নিহত ব্যক্তিকে খুন করেছে।' না কি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন নানা যুক্তির অবতারণা করে?

জানি এর উত্তরে আপনারা কি বলবেন! বলবেন, 'সত্য চিরদিনই সত্য, যাই হোক না কেন, তাতে সত্যের মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না।'

এসব জ্ঞান-গর্ভ কথা আমিও জানি। দরকার হলে এর চাইতেও অনেক ভাল ভাল যুক্তি আমি দেখাতে পারি। তাতে সত্যের মর্যাদা হয়তো শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে, কিন্তু বাস্তব? বাস্তবকে সেখানে অস্বীকার করা যাবে কি?

সপ্তাহ শেষ হতে তখনো তু'তিনদিন বাকি। ঘরে চাল বাড়ন্ত। ছেলে-মেয়েরা অভুক্ত রয়েছে সকাল থেকে। কি করব তখন আমরা সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে? 'তুমি সত্য, তুমি ধর্ম' বলে খোল-করতাল সহযোগে নাম-গান শুরু করব, না কি চোরাবাজারের দিকে পা বাড়াব রেশনের থলিটি হাতে নিয়ে? কোন্‌টা বাস্তব?

পুজোর পরে সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকি আবহমান-কাল থেকে। শত্রু-মিত্র কেউ সেখানে বাদ নেই। সবাই তখন আপনজন। সবাই সমান। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিশ্চিত-ভাবে দেশ ও সমাজের শত্রু বলে যাদের জানি, তাদেরও কি সেদিন আমরা মঙ্গল কামনা করে থাকি মনে মনে? না কি মুণ্ডপাত করে থাকি সবাই মিলে?

শত্রুরাষ্ট্রের কোন কেউকেটা ব্যক্তি পটল তুললে আমরাও সমবেদনা জানিয়ে বাণী পাঠিয়ে থাকি নিয়মমাফিকভাবে। বুকে হাত

দিয়ে বলতে পারেন কি, এর মধ্যে সত্যের স্থান কতটুকু? তাহলে একথাই কি বলা উচিত নয় যে, 'আপদ গেছে, এবার বাকিগুলোকেও শেষ করে দাও মা, তোমায় জোড়াপাঁঠা দেব।'

পর পর দুটো টেস্ট সিরিজে পতৌদি সাহেব আমাদের ডুবিয়েছেন। প্রথমে নিউজিল্যাণ্ড, পরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। তা হোক, তবু আদিখ্যেতা প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি নেই। কনগ্র্যাচুলেশন! হ্যাঁ সাহেব, তোমরা খেলেছ বটে। আশা করি পরের বারে আরো ভাল খেলবে।

সত্যিই কি পতৌদি আন্তরিকভাবে একথা বলেছিলেন? না কি মনে মনে বলেছিলেন, 'ওরে হতভাগা নচ্ছাবের দল, এই কি তোদের মনে ছিল! এভাবে তোরা আমার মুখে চুনকালি দিয়ে ছাড়লি! তোরা উচ্ছন্নে যা। গোল্লায় যা। তোদের সব ক'টার পায়ের পেশীতে টান ধরুক।'

এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। এটাকে অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হবে।

আমাদের হারাণবাবুর মুখেও সেই একই কথা। নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে বিজয়ী প্রার্থীকে মাল্যদান করে সে কি তার জ্ঞান-গর্ভ বাণী! আপনিই প্রকৃত দেশসেবক। আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক মাত্র।

সত্যিই কি সেদিন হারাণবাবু মন থেকে কথাগুলো বলেছিলেন? মিথ্যে কথা। আসলে বলেছিলেন, 'হারামজাদা, তোকে আমি দেখে নেব। এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব কিনা তোর জন্য জলে গেল! ঠিক আছে, যাবি কোথায়? রাত-বিরেতে পথ চলতে হবে না তোকে?'

'কোন কিছুর জন্যই সত্যকে পরিত্যাগ করা চলে না।'

খুব ভাল কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন! প্রথম যৌবনে মানুষ কত কি স্বপ্নই না দেখে থাকে। ভাবে, সংসারে এর চাইতে বড়

সত্য বুঝি আর কিছুই নেই। পরবর্তীকালে সে-কথা ভেবে তার হাসি পায় না কি? তাহলে কোন্‌টা প্রকৃত সত্য? আগেরটা, না পরেরটা?

এবার নিজের কথাই বলি। এই সেদিন আমার সহকর্মী দিলীপ নস্কর মস্তবড় একটা প্রমোশন পেয়ে গেল। সবাই খুশি। আমিও খুশি। হাজার হোক, সহকর্মী! তার এই অসামান্য প্রাপ্তিতে খুশি হবারই তো কথা।

কিন্তু সত্যিই কি আমি সেদিন খুশি হয়েছিলাম দিলীপের এই প্রমোশন-প্রাপ্তিতে? না কি মনে মনে বলেছিলাম, খুব দেখালি যা হোক! প্রমোশন পেয়ে উল্টোরথের ম্যানেজার হয়েছিস, সুখের কথা। তবে ওটা একটু এদিক-সেদিক হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

তারপর ধরুন নভেম্বর মাসের চার তারিখের কথা। সকাল থেকেই উল্টোরথ অফিসে সেদিন সাজ-সাজ রব। কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কারণ সদর ফটক বন্ধ।

খবর শুভ। 'আমি সুভাষ বলছি' বইটির অভাবনীয় সাফল্যের জন্য কাহিনীকার শৈলেশ দে নাকি সেদিন মাছ-ভাত খাওয়াবেন অফিসের সবাইকে। তাই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা চলেছে ভেতরে ভেতরে।

'মিথ্যে বলব না, খেয়েছি প্রচুর। বেশ খুশি মনেই খেয়েছি। 'আমি সুভাষ বলছি' আমাদের কাগজেই একদিন ছাপা হয়েছিল। শৈলেশবাবুও বলতে গেলে আমাদেরই লোক। সুতরাং খুশি না হবার কোন কারণ নেই। তাই সবার মত আমিও সেদিন তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি। গ্যাসও দিয়েছি প্রচুর। আহা, কি বইই না লিখেছেন মাইরি! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছেন মশাই। কিন্তু...

আজ্ঞে হ্যাঁ, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, এখানেও গোল বাধিয়েছে

ঐ 'কিন্তু'টাই। শৈলেশবাবুর মঙ্গল হোক, বা অচিরেই তাঁর একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি দেখা দিক, তাতে আমারও কোন আপত্তি নেই। আপত্তি অন্য জায়গায়। এককালে আমি অনেক খেটেখুটে, গোটা-কয়েক কলম ভেঙে 'মোহনবাগানের মেয়ে' নামে একটি বই লিখে-ছিলাম। ওটা কেন 'আমি সুভাষ বলছি'র মত জনপ্রিয় হল না? হলে এমন কি ক্ষতি হত? ভাবতে গেলে মনটা একটু কেমন কেমন করে না কি?

বিচারের ভার আপনাদের ওপর। এবার আপনারাই বলুন যে, আজকের দিনে কোন্‌টা বড়? সত্য, না বাস্তব? সত্য নিয়ে বড়জোর আমরা গাল-ভরা মোটা মোটা প্রবন্ধ লিখতে পারি, কিন্তু কঠিন, কঠোর দৈনন্দিন জীবনে এই রূঢ় বাস্তবটাকে অস্বীকার করতে পারি কি?

১লা বৈশাখ।

ঘুম থেকে উঠেই ঠিক করলাম, আজ যাকে পাব তাকেই যখ্‌ দেব। সারা বছর যখন এই করেই কাটাতে হবে, তখন বছরের প্রথম দিনে বউনী করে রাখাই ভাল।

'নব বৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা।'

রবীন্দ্রনাথের সে যুগ অনেককাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন যে যত বেশি যখ্‌ দিতে পারে, সে তত বড় বাহাদুর। সমাজে সে তত বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত। সবার মুখে তার ধন্য ধন্য রব। হ্যাঁ, একখানা ব্রেন বটে! কি খেল্‌টাই না দেখালে মাইরি!

মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, এযুগের চিরন্তন ধর্ম হল

যখ্ দেয়া। রাম তার বিজনেসের পার্টনার শ্যামকে যখ্ দিয়ে পথে বসিয়েছে, বিষ্ণু পাল তার ব্যাঙ্কের গণেশ উল্টে লাখ লাখ টাকা মেরেছে, অমুক ডিস্ট্রিবিউটার প্রোডিউসারের পুরো টাকাটাই চোট করে নিয়েছে, অমুক হাউসওয়ালা ফল্‌স্ টিকেট ব্যবহার করে কমসে-কম লাখখানেক টাকা ম্যানেজ করেছে, এ তো বলতে গেলে এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এযুগে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। যখ্ দেবার ব্যাপারটা তারাও এখন রপ্ত করে নিয়েছে বেশ ভালভাবেই। যেমন, 'জান লালুদা, উত্তম-কুমারের এই বইটা নাকি খুব ভাল হয়েছে।'

ব্যস, হয়ে গেল। এবার লক্ষ্মীছেলের মত টিকেটের দামটা বের করুন। মাসের শেষ হলেও রেহাই নেই। পারতেই হবে। নয়তো কালই দেখবেন যে, হাবুদা, ন্যাড়াদা, পাকাদাদের ভিড় জমে গেছে। তাদের ভিড়ে নিজেকে আর খুঁজেও পাবেন না কোনদিন।

মাসীমারাই কি কম যান! যেমন ধরুন, 'এই যে লালু! তোমার কথাই ভাবছিলাম বাবা। আহা, লালু আমার নিজের ছেলের চাইতেও বেশি। তা, সামনের রোববার চল না একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে পুজোটা সেরে আসি! ফেরার পথে বেলুড়টাও বরং ঘুরে আসা যাবে।'

বুঝুন ঠেলা! ট্যাক্সি-ভাড়া, পুজোর খরচাদি সব মিলিয়ে শ'-খানেক টাকার ধাক্কা তো বটেই। অবশ্য নিজের মাসী হলে এক ধমকে ঠাণ্ডা করে দেয়া যেত। কিন্তু পাড়ার মাসী! ইমপসিবল্! তাঁর অনূঢ়া কন্যাটির কথাটা ভাবতে হবে তো! তাঁর কাছে প্রেস্টিজ টাইট হলে কি করে চলবে? তার জন্য যদি হাত-ঘড়িটা বাঁধা পড়ে তো পড়ুক।

বস্তুত দুনিয়াটাই চলছে এখন এমনি যখ্‌বাজীর জোরে।

উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, যখ্ দেয়াটা এখন আভিজাত্যেরই একটা অঙ্গ। তাহলে আমিই বা ছেড়ে দেব কেন, বলুন? বিশেষ করে আজকে বছরের প্রথম দিনে? এমন দিনে যখ্ না দেয়াটাই বরং বোকামী।

আরো কারণ আছে। নববর্ষ উপলক্ষে রাত্রে বাসায় একটু ছোটখাট উৎসবাদির ব্যবস্থা রয়েছে। খরচপত্তরও হবে বেশ কিছু। যখ্ দিয়ে সে টাকাটা যদি উঠিয়ে নেয়া যায় তো মন্দ কি।

শুভস্য শীঘ্রম্, তাই জামা-কাপড় পরে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম শিকারের সন্ধানে। অবশ্য শিকারের জন্য ভাবনা নেই। ও ঠিক জুটে যাবেই। মানুষ মাত্রেরই একটা দুর্বলতা থাকে। সেটুকু জেনে নিয়ে যথাস্থানে ঘা দিতে পারলেই, ব্যস। টুপ করে তখন আপনা থেকেই হাতের মুঠোয় ফলটি খসে পড়বে।

প্রথমেই পেয়ে গেলাম বুদ্ধুকে। যাকে বলে সেয়ানা ছেলে। যখ্ দিতে সে-ও বড় একটা কম যায় না। দেখাই যাক না যে, আজকের খেলায় কে হারে, কে জেতে? এগিয়ে গিয়ে বললাম, এই যে বুদ্ধু! হ্যাঁরে, ব্যাপার কি বল দেখি! শুনলাম তোদের অফিসে নাকি বেশ কিছু লোক ছাঁটাই হচ্ছে?

—ছাঁটাই! শুনেই ভড়কে গেল বুদ্ধু!

—হ্যাঁ, কাল বড়দাকে তোদের ম্যানেজার বলছিল। বড়দার ফ্রেণ্ড কিনা!

—সর্বনাশ! বুদ্ধুর দু'চোখে দুর্বোধ্য দৃষ্টি, এখন উপায়! এ বাজারে চাকরি গেলে···

—যা বলেছিস ভাই! নিমেষে মুখখানাকে করুণ করে তুললাম, এযুগে চাকরি করাটাও একটা ঝকমারি। এই আমার অবস্থাই দেখ না! দু'বছরে একটি পয়সাও মাইনে বাড়েনি। অবশ্য আজ রাত্রে ম্যানেজার বেটাচ্ছেলেকে বাসায় খাবার নেমন্তন্ন করেছি। বাড়ি এনে একটু অয়েলিং করা আর কি! দেখা যাক, তাতে

যদি কিছু হয়। তা, তোর সঙ্গে তোদের ম্যানেজারের রিলেশন কেমন?

—আরে ভাই, ওখানেই তো হয়েছে যত মুশকিল। বেটাচ্ছেলে দু'চক্ষে দেখতে পারে না আমাকে। তা, তোর দাদাকে আর কি কি বললে? কে কে ছাঁটাই হবে, বললে কিছু?

—বলেছে তো অনেক কিছুই। তা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোকে এত কথা কি করে বলি বল?

ব্যস, যা ভেবেছি ঠিক তাই। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধু বললে, চল ঐ চায়ের দোকানটাতে গিয়ে বসা যাক। চা খেতে খেতে সব শোনা যাবে।

—তোর দাদাকে আমার কথা একটু বল না ভাই! খেতে খেতে সেকি আকুলি-বিকুলি বুদ্ধুর, বলবি তো! আমি বরং ও-বেলা তোর বাসায় গিয়ে খোঁজ নেব।

—ও-বেলা আমাকে বাসায় পাবি নে। বেশ ডাঁট দেখিয়ে বললাম, ভেবেছি একবার উল্টোরথ অফিসে যাব। যেতে হয় তো কাল-পরশু যেদিন খুশি যাস।

চা খেয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে এলাম। থ্রি চিয়ার্স ফর নিউ ইয়ার! বুদ্ধুর মত খলিফা ছেলেকে যখন যখ্ দিতে পেরেছি, তখন আর ভাবনা কি? নাঃ! বউনীটা ভালই হয়েছে দেখছি! দেখা যাক, এর পরে কি দাঁড়ায়!

খানিক বাদেই পেয়ে গেলাম ফ্লপ মাস্টার জেনারেল ডিরেক্টর হেবো রায়কে। ভদ্রলোক জীবনে যতগুলো ছবি করেছেন—সব ফ্লপ। তা বলে তিনি আশা ছাড়েননি। এখনো পার্টি খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিরলসভাবে।

বেশ একটু পোজ নিয়ে বললাম, এই যে মিঃ রায়। কন্‌-গ্র্যাচুলেশন্! তারপর, শুটিং শুরু করছেন কবে, বলুন?

—শুটিং! হেবো রায় অবাক।

—কেন লুকোচ্ছেন দাদা? বন্‌সালের পরের ছবিটা যে আপনিই করছেন, সে কি আর আমি জানি নে বলতে চান? ভদ্রলোক নিজে আমাকে বললেন, পরের ছবিটা হেবোবাবুকে দিয়ে করালে কেমন হয়?

—ব-ব-ব বন্‌সাল! রেগুলার তোতলাতে শুরু করলেন হেবো রায়, উনি নিজে বলেছেন! চলুন দাদা, ঐ স্যাঙ্গুভ্যালীতে গিয়ে একটু বসা যাক। তারপর সব শুনব।

পুরো পাঁচ টাকা চোট, তবু মন উঠল না। বললাম, আপনার কাছে গোটা ত্রিশেক টাকা হবে মিঃ রায়? ছুটির দিন, ব্যাঙ্ক বন্ধ। চেক্ যে কাটব তারও উপায় নেই। অবশ্য কালই এটা আমি রিটার্ন করে দেব।

—বিশ্বাস করুন, আমার কাছে এখন আর কোন টাকা নেই। অসহায় ভঙ্গিতে বললেন হেবো রায়, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, ওবেলা আপনি পেয়ে যাবেন। বিকেল চারটের মধ্যে আমি নিজে গিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব। তবে দেখবেন দাদা···

—ঠিক আছে, তার জন্য আপনি ভাববেন না। হেবো রায়কে ষোল আনা ভরসা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। টোপ যখন গলেছে, তখন যাবে কোথায়! আমি নিশ্চিন্ত যে, ঠিক সময়েই উনি টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসবেন। ধার করে হলেও দেবেন।

এবার পেলাম শর্মিলা ব্যানার্জিকে। বড়লোকের বাউণ্ডুলে মেয়ে। জীবনের একমাত্র সাধ, ছবিতে নেমে সুচিত্রা সেন হবেন। চেষ্টাও করেছেন প্রচুর, কিন্তু সব বৃথা। খ্যাঁদা নাকটাই সব আপসেট্ করে দিয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, এই যে মিস ানার্জি! নমস্কার! কেমন আছেন বলুন?

আরে বাসরে বাস! সে কি দেমাক! বারেক ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে পরক্ষণেই তিনি দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অসীম বিরক্তিতে।

ভাবটা এই যে, হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! এমন কত কাপ্তেন গিলে খেলাম, আর ও এল কিনা আমার সঙ্গে মস্করা করতে!

হেসে বললাম, কাল সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা হল। উনি নতুন হিরোইন চাইছেন কিনা!

—অ্যাঁ: সত্যজিৎ রায়! সঙ্গে সঙ্গে কি বিরাট পরিবর্তন। আনন্দে, আশায় ও উদ্বেগে দিশেহারা হয়ে মিস ব্যানার্জি বললেন, তা—তা, উনি কি বললেন? হোপ্-টোপ্ আছে কিছু?

—হোপ্-টোপ্ বুঝি নে, তবে এসব ব্যাপারে বরাবরই উনি আমার ওপর একটু ডিপেণ্ড করে থাকেন। তবে মুশকিল কি জানেন? ভাল করে না জেনে-শুনে কাউকে সার্টিফাই করা কোনদিনই আমার প্রিন্সিপল্ নয়।

—না না, সে জন্য আপনি ভাববেন না। কণ্ঠে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল মিস ব্যানার্জির, আমি পারব। নিশ্চয়ই পারব। জানেন ইয়েদা, আপনাকে আমার এত ভাল লাগে যে, কি বলব! মা তো রোজই আপনার কথা বলেন। আজ কিন্তু আপনাকে কিছুতেই ছাড়ব না। যেতেই হবে আমাদের বাড়িতে। লক্ষ্মীটি ইয়েদা, চলুন না! প্লীজ!

যেতেই হল। ভ্রুকুটি থেকে এক পলকেই যখন 'ইয়েদা'র পর্যায়ে উঠে গেছি, তখন না গিয়ে আর উপায় কি! সুতরাং গেলাম। যথ্ও দিলাম বেশ ভাল করেই। তবে মেয়েটি ভাল। তার চাইতেও তার মা আরো ভাল। ইয়েদার জন্য তাদের সেকি ব্যাকুলতা! যেন ইয়েদা মারা গেলে মা-মেয়ে একসঙ্গেই সহমরণে যাবে আর কি!

বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার তুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম পথে। এবারের লক্ষ্য উল্টোরথ অফিস। হোক সহকর্মী, তা বলে আজকের দিনে কাউকে খাতির নেই। ছোট-

বড়-মাঝারি যাকে পাব, তাকেই রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট চোট্ করে যাব।

গুড্ লাক! প্রথমেই পেয়ে গেলাম ম্যানেজার দিলীপ নস্করকে। বললাম, প্রেমেনদা মস্তবড় একটা উপন্যাস ধরেছেন। অর্ধেকটা প্রায় কমপ্লিট।

—প্রেমেনদা! নিমেষে সচকিত হয়ে উঠলেন দিলীপ নস্কর, ঠিক জানেন তো?

—জানি মানে! নিজে আমাকে পড়ে শোনালেন। চমৎকার লিখেছেন। অপূর্ব!

—এটা রাখুন। নিমেষে ড্রয়ার খুলে দশ টাকার একটি নোট এগিয়ে দিলেন দিলীপ নস্কর, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত্রি এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হতে দেবেন না যেন। এমন কি বাথরুমে বা পায়খানায় গেলে সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করবেন পিছু পিছু গিয়ে। মোট কথা, লেখাটা আমাদের চাই-ই!

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম টাকাটা পকেটস্থ করে। মালকড়ি যখন ম্যানেজ হয়ে গেছে, তখন কেটে পড়াই মঙ্গল। তাছাড়া অফিসের ম্যানেজারকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

অদ্ভুত একটা অনুভূতির মধ্য দিয়ে ফিরে চললাম বাসার দিকে। নাঃ! বউনীটা আজ ভালই হয়েছে। সত্যি বলতে গেলে বুদ্ধু থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কম ম্যানেজ হয়নি। তাছাড়া হেবো রায়ের ত্রিশ টাকা তো আছেই। ও ঠিক রেখে যাবে।

বাড়িতে পা দিতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটে এলেন আমার হোমগার্ড, হার হাইনেস দি গ্রেট পদির ওগো, সেই মুখপোড়া মিন্‌সে এসেছিল।

—এসেছিল! আমি অবাক। কে এসেছিল?

—কেন, তোমাদের ম্যানেজার সাহেব! তুমি যাবার কিছুক্ষণ

পরেই এসে হাজির। বললে, রাত্তিরে নাকি কি জরুরী কাজ রয়েছে, তাই আগেই আসতে হল। কি আর করি! তাড়াতাড়ি ঘরে এনে বসালাম। খুব আদর-যত্ন করেছি। দেখো, এবার তোমার ঠিক মাইনে বাড়বে।

বোকার মত তাকিয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে। কি ব্যাপার!

একটানা বলতে লাগলেন শ্রীমতী, এই তো খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টা-খানেক আগে চলে গেল। যাবার আগে একশো টাকার নোটের ভাঙানী নেই বলে ট্যাক্সি-ভাড়ার জন্য আরো দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল। বললে, কাল তোমাকে অফিসে ফেরত দেবে। এই যা! আসল কথাই ভুলে গেছি। তোমাকে দেবার জন্য একখানা চিঠি রেখে গেছে। আঁচলে বেঁধে রেখেছি। এই নাও।

চিঠি পড়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। লেখা আছে ঃ

'বুদ্ধুকে যখ্ দেয়া তোর মত হাঁদারামের কম্ম নয়। ও-বেলা কাদয়া করে সব জেনে নিয়েছিলাম। এ-বেলা নিজেই এসে হাতে-কলমে তা প্রমাণ্ করে দিয়ে গেলাম। নববর্ষের আয়োজনটা কিন্তু ভালই করেছিলি। চেটে-পুটে সব খেয়ে গেলাম। একমাত্র চাটনীটা রেখে গেলাম তোর ম্যানেজারের জন্য।

কে একজন লোক তোকে দেবার জন্য ত্রিশটি টাকা নিয়ে এসেছিল। তোর বউ তখন রান্নাঘরে। ওটাও নিয়ে গেলাম। তাছাড়া ট্যাক্সি-ভাড়া বাবদ নিয়ে গেলাম আরো দশ টাকা। নববর্ষের যখ্টা মোটামুটি ভালই দিলাম—কি বলিস!

—তোর বুদ্ধু'

সিনেমা জগৎ

জনৈক পাঠক প্রশ্ন করেছেন : গত দু'বছরে আপনার কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। প্রতিদানে আমাদের কাছ থেকে কি আপনার কিছুই চাইবার নেই ?

উত্তরে বলছি : হ্যাঁ, আছে। নিশ্চয়ই আছে। বিশ্বাস করুন, পাঠক-পাঠিকাদের চাইতে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। সুতরাং কিছু চাইতে হলে সর্বাগ্রে তাদের কাছেই চাইব, সে তো বলাই বাহুল্য। বেশ খোলাখুলিভাবেই চাইব। দ্বিধাহীন চিত্তেই চাইব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

অবাক হবার কিছু নেই। কবি মানুষ, সুতরাং চাইতে গিয়ে ভুল করাটাই তো স্বাভাবিক। আমার মশাই ওসব কবিতা-টবিতা আসে না। যাকে বলে নেহাত কাঠখোট্টা ধরনের মানুষ। সুতরাং চাইতে গিয়ে আর যা-ই করি নে কেন, ভুল যে কিছুতেই করব না, সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

না না, ভয় পাবেন না। আশাতীত কিছু আমি চাইব না। দাবি আমার খুবই সামান্য। এত সামান্য যে, সে দাবি মেটানো আপনাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।

কি, রাজী ! কথা দিচ্ছেন ! উঁহু, ঐটি চলবে না। সর্বত্র আজ এক রব যে, বর্তমান সরকারের আমলে প্রতিটি জিনিসের দাম নাকি বিশগুণ চড়ে গেছে। সত্যিই কি তাই !

মিথ্যে কথা। লক্ষ্য করে দেখুন যে, কথার দাম আজকাল একদম পড়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, মানুষের কথা বা প্রতিশ্রুতির কোন দামই নেই এযুগে। এ ব্যাপারে কি সরকার, কি পুলিশ, কি

দেশনেতা, কি ব্যবসায়ী, কি পাবলিক সব সমান। সোজা কথায় এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

এ ব্যাপারে আমরা, অর্থাৎ নাইনের লোকরাই কি পিছিয়ে আছি ভেবেছেন। কক্ষণো না। বরং ইচ্ছে করলে অনেক আচ্ছা আচ্ছা নেতাকেও আমরা এ ব্যাপারে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি। আপনাদের বাপ-মায়ের ছিচরণের আশীর্বাদে সে হিম্মত আমরা রাখি।

সুরশিল্পী সুধীরলালের মৃত্যুর কথাই ধরুন। আরে বাস্‌রে বাস্! সুধীরলালের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে সেদিন শিল্পীদের সে কি আকুলি-বিকুলি! সে কি বুকফাটা কান্না! অহো, কি পরিতাপ! আমাদের সুধীরদা নেই। কুছপরোয়া নেই বৌদি, সুধীরদা না থাক, আমরা তো আছি। আমরা থাকতে আপনার ভাবনা কি! আমরা সুধীরদার চিতার ওপর মঠ তুলব। মন্দির তুলব। ফাণ্ড গড়ব। আরো—আরো অনেক কিছু করব, আপনি শুধু দেখে যাবেন।

দেখার জন্য ভদ্রমহিলাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। তাই নিজেই নিজের পথ বেছে নিলেন শেষ পর্যন্ত। ভাগ্যিস তাই করেছিলেন, নইলে অনেক দুঃখ ছিল কপালে।

তারপর সুরশিল্পী অনুপম ঘটক। সেদিনের দৃশ্য আরো মারাত্মক। গাইয়েদের মধ্যে অনেকেই সেদিন কেঁদেছিলেন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে। দু'একজন তো অজ্ঞানই হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। অনুপমদাকে ভুলব না। চিরদিন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখব আমাদের সৃষ্টির মধ্যে। আমরা তাঁর নামে স্কুল করব। কলেজ করব। অনেক কিছু করব।

আর আজ! আজ স্বর্গীয় সুরকারের মৃত্যু-তারিখটাও হয়তো কেউ বলতে পারবেন না সঠিকভাবে। কি লাভ? বেঁচে থাকলে রেকর্ড করা যেত। প্লে-ব্যাকে চান্স পাওয়া যেত। তার সুরে সুপারহিট

গান গেয়ে মোটা হারে রয়্যালিটি টানা যেত। মৃত্যুর পরে ওসব নিয়ে কে আর ঝামেলা করতে যায় মশাই!

পরবর্তী যাত্রী চিত্রজগতের সর্বজনবরেণ্য শিল্পী ছবি বিশ্বাস। সেদিন আমরা লরীতে বসে কি কান্নাটাই না কেঁদেছি। প্রচুর কেঁদেছি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেঁদেছি। কেন কাঁদব না? সে যে আমাদের সাতরাজার ধন ছবিদা! সে অজর। অমর। তার মৃত্যু নেই। তার নামে আমরা রাস্তা করব। নাট্য-মঞ্চ করব। হেন করব। তেন করব। তার জন্য যদি জান কবুল করতে হয় তো সে ভি আচ্ছা।

তারপর! তারপর আবার কি! যেতে হয় গিয়েছি, হায় হায় করেছি, বুক চাপড়ে কেঁদেছি, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। এরপর আবার আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন মশাই?

তা বলে ছবিদার জন্য কি আমরা কিছুই করিনি? নিশ্চয় করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইচ্ছেমত রেট্ বাড়িয়েছি। সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে আমরা তেরাত্তিরও পার হতে দিইনি। ছবিদা মহানুভব ব্যক্তি সন্দেহ নেই। তিনি নেই বলেই তো আমরা সে সুযোগ পেয়েছি। থাকলে কি আর সম্ভব হত! একাই তো পথ জুড়ে বসেছিলেন। ভাগ্যিস্ তিনি নেই!

এরপর পল্লীসঙ্গীত-গায়ক গিরীন চক্রবর্তী। ই একই ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে আমাদের যা করণীয় কাজ, কিছুই তার বাদ দিই নি। বিরাট শোকসভা। বিরাট আয়োজন। বক্তার তালিকা বিরাট। বললেন অনেকেই। আমিও বললাম। বেশ ভাল ভাবে জ্ঞানগর্ভ কথা বললাম সেদিন। অসুবিধের কিছুই ছিল না। [illegible]াগও বলতে বলতে এগুলো তো মুখস্থই হয়ে আছে। সুতরাং বলা ল্পী গিরীন চক্রবর্তী ও তার শিশু কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখার পবিত্র নে ব্য আজ থেকে আমাদে 'ই' বলে হাততালি পেতে এতটুকুও কষ্ট হু ।

তারপর। তারপর সভা শেষ। আমাদের পবিত্র কর্তব্যও শেষ। সুতরাং চা ও কোকো-কোলা শেষ করে দিব্বি ফিরে এলাম ড্যাং ড্যাং করে। এবার বুঝুন গে গিরীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী, আর তার আত্মীয়পরিজনবর্গ। আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

পরবর্তী পালা হবে বহুরূপীব। না না, ঠাট্টা নয়। সত্যিই বলছি। দিন আগত ঐ। আজ্ঞে না, আমার জন্য কাউকে কাঁদুনী গাইতে হবে না। কোনরকম শোকবার্তাও পাঠাতে হবে না। স্মৃতি-সভা তো নয়ই। ওসবে আমার এতটুকুও আস্থা নেই। আমি মশাই নগদ কারবারের কারবারী, তাই বিদেয়টাও হাতে হাতে নগদ পেতে চাই। ধার বা বাকিতে নয়। কোনরকম প্রতি-শ্রুতিও নয়।

জানি, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। ভাবছেন, অত ধানাই-পানাই না-করে কি চাই তা বলে ফেললেই তো হয় বাপু!

বেশ, তাই বলছি। চাই সতেরোটি টাকা। মাত্র সতেবোটি টাকা। শুনেছি বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দাহ করতে নাকি সতেরো টাকা লাগে। ব্যস, ঐ সতেরো টাকার দায়টুকুই অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে আমি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের ওপব চাপিয়ে দিতে চাই। বহুরূপীর কাছে অনেক পেয়েছেন বলে যাঁরা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চান, তাঁদের কাছে এইটুকুই শুধু আমার দাবি।

অসুবিধের কিছু নেই। বহুরূপীর ভক্ত-সংখ্যা আজ কম করে হলেও হাজার কয়েক তো হবে নিশ্চয়ই। জনপ্রতি এও বয়া পয়সা করে চাঁদা পাঠালেই যথেষ্ট। অথবা ইচ্ছে কবলে আ লজ নাম করে হিন্দু সংকার সমিতির বা কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের অক্রম ।ও জমা দিতে পারেন। এখন যা আপনাদের অভিরুচি। মিবিং

হ্যাঁ, আর একটা জিনিসও চাই। একটা মাকর্ত্রচ সরকারী ভি. আই. পি.-দের মত গলায় মালা ঝুলিয়ে পথ চলার ন নাসুে আমার

বহুদিনের। এই সুযোগে ওটাও মিটিয়ে নিতে চাই। অবশ্য ওটা উল্টোরথ কর্তৃপক্ষই সেদিন আমাকে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। তবে বিশ্বাস নেই। হক কথা বলার জন্য যে-ভাবে আমার ওপর রেগে আছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত শ্মশান থেকে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালা এনে দিলেও তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তা দিক! মালা ইজ্ মালা। ভি. আই. পি.-দেরই কি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালা পরতে হয় না?

সম্প্রতি আমার বেশ একটু নাম হয়েছে। না না, হাসির কথা নয়। দু'চোখ ছুঁয়ে বলছি। এবারের নির্বাচন উপলক্ষে সত্যিই আমার খুব নাম হয়ে গেছে।

শুধু কি তাই! পত্রিকায় বহুরূপীর একটি ছবি দেখার জন্য আপনাদের সে কি অনুরোধ! সে কি সকাতর মিনতি! কিন্তু কে কার কথা শোনে! কর্তৃপক্ষের সাফ জবাব, বহুরূপ' ' ছবি দেখলে নাকি বাচ্চারা রাত-বিরেতে ভয় পাবে।

এবার সে আশাও পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নামী খবরের কাগজেই আমার ছবি ছাপা হয়ে গেছে। না না, পয়সা খরচ করে ছাপতে হয়নি। ওরা নিজেরাই আগ্রহ সহকারে ছেপেছে।

খুলেই বলছি। ভোট-গ্রহণের তখন দিনকয়েক মাত্র বাকি। রোজই এখানে-ওখানে দু'চারটে কং বোমা পটকা ফাটছে বলে খবর আসছে। হঠাৎ নিজেই সেদিন খবর হয়ে গেলাম। আচমকা

প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে ঘুরে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পেলাম ঘণ্টাখানেক বাদে। চোখ মেলে তাকিয়েই অবাক। আরে বাস রে বাস! চারপাশে কাতারে কাতারে লোক। বাড়িতে তিল-ধারণেরও জায়গা নেই। সবার মুখে একই প্রশ্ন। কি করে এটা হল? কে মারলে এমন করে?

—কে মারলে এখনো তা বুঝতে পারেননি? ফুঁসে উঠল জনৈক তরুণ যুবক, এসব হল স্রেফ গুণ্ডামী। কিছুতেই আমরা এসব মুখ বুজে সহ্য করব না।

বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গে সঙ্গে একমত হলেন উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী। এ ধরনের গুণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়।

পরদিন সকালে জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে আমি অবাক। একি! এ যে আমার ছবি দেখছি! মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমার ছবি ছাপা হয়েছে। নিচে রয়েছে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ।

"১০ই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার। বোমার আঘাতে সুপ্রসিদ্ধ ভড়কি-বিশারদ শ্রীবহুরূপী আহত। গতকল্য সন্ধ্যায় কে বা কাহারা বহুরূপীর বাড়িতে ঢুকিয়া পর পর তিনটি মারাত্মক ধরনের বোমা নিক্ষেপ করিয়া সবার অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে। ফলে তিনি গুরুতর-ভাবে আহত হন। বাড়ির আসবাবপত্তরেরও বেশ কিছু ক্ষতি হয়।

শ্রীবহুরূপী দক্ষিণ কলিকাতার একজন সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী নেতা। সুতরাং, এই সুপরিকল্পিত আক্রমণের পিছনে যে কাহাদের হাত রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে প্রশ্ন করি যে, এ ধরনের দৌরাত্ম্য আর কতকাল আমাদের মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?"

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! কি আশ্চর্য! বামপন্থী কাগজগুলোতেও যে আমার ছবি রয়েছে দেখছি! নিচে লেখা রয়েছে :

"কুখ্যাত গুণ্ডাদের আক্রমণে বাংলার সুপরিচিত বামপন্থী নেতা শ্রীবহুরূপী আহত। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গতকল্য সন্ধ্যায় বহুরূপী যখন নিজের ঘরে বসিয়া পার্টির কাগজপত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদল ভাড়াটে গুণ্ডা তাঁহাকে নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করিয়া পলাইয়া যায়।

আমরা পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে, এই ধরনের জঘন্য ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তাঁহারা দেশকে অনিবার্যভাবেই রক্ত-বিপ্লবের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। কারণ, দেশের মেহনতি শ্রমিক, মজুর ও তরুণদল কখনই এ ধরনের অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন না!"

মজা হল বিকেলে। হঠাৎ জনকয়েক উৎসাহী কর্মী একেবারে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। মিটিংয়ে যেতে হবে।

মিটিং! আমি অবাক। মিটিংয়ে গিয়ে আমি কি করব!

কিছুই করতে হবে না স্যার। জবাব দিলেন একজন, শুধু মুখখানা করুণ করে চুপচাপ ডায়াসে বসে থাকবেন।

গেলাম। এত আশা করে যখন এসেছে, তখন ফেরাই কি করে! যথাকালে আমাকে দেখিয়ে শুরু হল বি[illegible] বক্তার জ্বালাময়ী ভাষণ।

'বন্ধুগণ, আপনারা নিজেরাই দেখুন। নিজেরাই বিচার করুন। বাংলাদেশে আজ বহুরূপীকে কে না চেনে! কে না ভালবাসে! কে না তাঁর ভড়কি শুনে আনন্দ উপভোগ করেছে! ইনি শান্তি ও গণতন্ত্র নীতিতে বিশ্বাসী বলেই আজ তাঁকে বিশেষ একটি দলের গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে এমনি করে।

'তবে এজন্য আমরা ভীত [illegible]। এই সব ঘৃণ্য কাপুরুষের দল যেন মনে রাখে যে, এর উপযুক্ত জবাব আমরা দিতে পারি। ইচ্ছা

করলে এই মুহূর্তে আমরা তাদের পানামা খালের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। সে শক্তি আমাদের আছে।

কিন্তু আমরা তা দেব না। কারণ, আমরা গণতন্ত্রের আদর্শে আস্থাবান। তাই এব জবাব দেব আমরা ভোটের মাধ্যমে। বন্ধুগণ, এবার আপনারাই চিন্তা করুন যে, কাকে আপনারা ভোট দেবেন। গত উনিশ বছর ধরে গঠনমূলক কাজের দ্বারা দেশকে যারা ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে—তাদের, না অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশের শান্তি যারা ব্যাহত করতে চায়, সেই বিদেশী দালালদের?'

এখানেই শেষ হল না। এরপর আমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে শুরু হল এক বিরাট মিছিল। শুরু হল নানাবিধ স্লোগান। "বহুরূপীকে মারল কে, বিদেশী দালাল, আবার কে?"

বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই অন্য দল এসে হাজির। চলুন দাদা। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

যেতেই হল। তারপব সেই একই ধরনেব গরম বক্তৃতা।

'বন্ধুগণ, মার্কিন পুঁজিপতিদের কাছে আজ যারা দেশের সর্বস্ব, এমনকি দেশের আত্মসম্মান পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছে, সেই বিদেশী টাকায় পুষ্ট মার্কিন দালালদের আপনারা ভালো করে চিনে রাখুন।

উনিশ বছরের অবাধ লুণ্ঠনেব ফলে দেশের যে আজ কি হাল হয়েছে সেকথা সরকাব খুব ভালো কবেই জানে। তাই গদী-চ্যুতির আশঙ্কায় স্বভাবতঃই ভারা হিংস্র ও মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রমাণ—এই বহুরূপী। ভাড়াটে গুণ্ডাদের নির্লজ্জ আক্রমণ থেকে বাংলাদেশের এই পরম শ্রদ্ধেয় নেতাও রেহাই পাননি। বন্ধুগণ, আসন্ন নির্বাচনে আপনাদের দলবদ্ধভাবে এই গুণ্ডামীর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। এ দায়িত্ব আপনাদের সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে।'

তারপর সেই একই ধরনের মিছিল। একই ধরনের স্লোগান। "বহুরূপীকে মারল কারা? মার্কিনের দালাল যারা।"

আশ্চর্য, পরদিন বিকেলে আবার সেই গাড়ি এসে হাজির। আজ নাকি অন্য মহল্লায় মিটিং। ওখানে যেতে হবে। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল মশাই। চালাকী পায়া হ্যায়! চেনে না বহুরূপীকে! ঠিক হ্যায়, চিনিয়ে দিচ্ছি।

বললাম, ঠিক আছে, যাব। তার আগে কিছু মালকড়ি ছাড়ুন দেখি।

—মালকড়ি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন গাড়ির মালিক, বলছেন কি আপনি! দেশ ও দশের জন্য…

—ওসব ভড়কি ছাড়ুন দাদা, কোন সুবিধে হবে না। মনে রাখবেন যে, ভড়কি দিতে বহুরূপী আপনার চাইতে কিছু কম যায় না। সুতরাং হয় শ'খানেক টাকা ছাড়ুন, নয় তো সোজা কেটে পড়ুন। ও পার্টি যখন দিতে রাজী হয়েছে, তখন যেতে হয় তো ওদের মিটিংয়েই বরং যাব।

—ও পার্টি! কি সর্বনাশ! না না, ওখানে আপনাকে যেতে হবে না। এই নিন টাকা। চলুন এবার।

যা ভেবেছি, ঠিক তাই। যথাসময়ে ও-পক্ষ এসে হাজির। তারপর সেই একই উত্তর। আগে একখানা বড়পাত্তি ছাড়ুন, তারপর অন্য কথা।

—সে কি! যেন মূর্ছা গেলেন ভদ্রলোক, আমাদের গরীব পার্টি। ছেলেদের সামান্য চা খাবার পয়সাটা পর্যন্ত দিতে পারি নে। এ অবস্থায়…

—বুঝি দাদা, সবই বুঝি। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, আমিও এদেশের লোক। আমার কি দেশের প্রতি একটা কর্তব্য নেই? এতটুকুও দয়ামায়া নেই? কিন্তু কি করব বলুন! গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই এক। সবাই সমান। সেখানে জেনে-শুনে আর তো কাউকে ছোট-বড় করতে পারি নে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে। বাধা দিয়ে বললেন অন্য একজন,

আপনি চুপ করুন হারুদা। চেনেন না তো বহুরূপীকে। একেবারে কড়া মাল। তার চাইতে আমি পার্টি-অফিসে ফিরে যাচ্ছি। সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে যে কবে হোক, টাকাটা ম্যানেজ করে নিয়ে আসছি।

সিকি, আধুলি, দশ নয়া, পাচ নয়া মিলিয়ে পুরো টাকাটা পকেটস্থ কবে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বউনীটা মোটামুটি ভালই হয়েছে। এ-।ার দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

না, ভালই হয়েছিল। বিশেষ করে শেষের কয়েকটা দিন তো খুবই ভাল হয়েছিল। রেটও ক্রমশ বেড়েছিল। কেন বাড়বে না বলুন? চাহিদা থাকলেই যে রেট বাড়ে এ তো জানা কথাই। সুতরাং মওকা যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ব কেন? মাগ্যিগণ্ডাব দিনে ফোকটে হাজার কয়েক টাকা পাওয়া—একি চাট্টিখানি কথা!

ভাগ্যিস কলতলায় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলাম।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ সেদিন বন্ধুবর অবিনাশ এসে হাজির। চোখে-মুখে তার গভীর উৎকণ্ঠা। বড় বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি ভাই। তোকে একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।

—কোথায়? প্রশ্ন করলাম অবিনাশকে।

—পাত্রী দেখতে।

পাত্রী দেখতে! আমি অবাক। যে অবিনাশ হাজার বলা

সত্ত্বেও কোনদিন এ পথে পা বাড়াতে রাজী হয়নি, হঠাৎ তার পাত্রী দেখার শখ হল কেন? কি ব্যাপার! কোথায় যেতে হবে ওর সঙ্গে?

—হোটেলে। চৌরঙ্গীর একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম করল অবিনাশ।

—হোটেলে! কি ব্যাপার বল তো?

সব কথাই খুলে বলল অবিনাশ। গত সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় পোস্টবক্স দেয়া একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, দেখে থাকবি হয়তো। তাতে লেখা ছিল: 'নির্ঝঞ্ঝাট পাত্র চাই, পাত্রী শিক্ষিতা ও সুন্দরী, বয়েস চব্বিশ বছর, পাত্র নিজে আবেদন করুন।'

হঠাৎ কি খেয়াল হল কে জানে, দিলাম সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি পোস্ট করে। আজ তার জবাব এসে হাজির। লিখেছে আমাকে নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে। তবে এ সম্বন্ধে মুখোমুখি আলাপ করে কয়েকটা কথা তিনি ভাল করে জেনে নিতে চান। সন্ধ্যা সাতটায় হোটেল ইডেনের এগারো নম্বর কেবিনে তিনি অপেক্ষা করবেন আমার জন্য। সেখানেই ডিনার খেতে খেতে কথাবার্তা হবে। তোকে সে সময়ে থাকতে হবে আমার সঙ্গে।

—কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে?

—খুব দেখাবে। কথাবার্তাও আমার হয়ে যা কিছু বলার, তোকেই বলতে হবে। জানিস তো আমি একটু নার্ভাস টাইপের লোক। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন যেন প্যালপিটিশন শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। এসব আলাপ-আলোচনা তো বরাবর বাবা-মায়েরাই করে থাকেন বলে জানি। তা কিনা স্বয়ং একেবারে পাত্রী এসে হাজির! তাও কিনা আবার হোটেলের কেবিনে! যাক, তুই রেডি থাকিস। আমি 'ফোন' করে জানিয়ে দিচ্ছি তাকে।

ঠিক সাতটায় দুজনে গিয়ে হাজির হলাম হোটেল ইডেনের এগারো নম্বর কেবিনে। অপরপক্ষ আগে থেকেই উপস্থিত। সুতরাং চিনে নিতে কোনরকম অসুবিধে হল না।

ঠিকই বলেছিল অবিনাশ। সুন্দরীই বটে। অবশ্য গায়ের রঙ স্বয়ং মা কালীকেও লজ্জা দেয়, তবে কড়া মেক্-আপের জন্য খুব অভিজ্ঞ চোখ না হলে সেটা চট্ করে ধরা যায় না। আর বয়েস! থাক।

অর্ডার আগেই দিয়ে রাখা হয়েছিল, তাই খেতে খেতে এবার জেরা শুরু করলেন শ্রীমতী। আপনার আবেদন আমি খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি মিঃ সরকার। আমার দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ নেই। তবে ফাইনাল কথা দেবার আগে আমার কয়েকটা কথা ভাল করে জেনে নেয়া দরকার।

—বেশ, বলুন। অবিনাশের হয়ে আমিই জবাব দিলাম পাত্রী মিস হালদারকে।

—আমার প্রথম প্রশ্ন, বাড়িতে কোন বুড়ো বাপ-মা আছে কি না। ওসব ঝুট্-ঝামেলা আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে রাজী নই।

—বেশ। আর কি বক্তব্য আছে এক এক করে বলে যান। তারপর আমাদের কথা আমরা বলব।

—সংসারে ননদ বা দেবর থাকা চলবে না। কি করে যে মানুষ এসব স্ট্যাণ্ড করে ভেবে পাই নে।

—থামবেন না। বলে যান।

—আমি সাধারণ মেয়ে নই, গ্র্যাজুয়েট। সোসাইটিতে আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। তাই কলকাতা শহরে একখানা নিজস্ব বাড়ি থাকা চাই। সেই সঙ্গে একখানা গাড়ি।

—আর কিছু? প্রশ্ন করলাম শ্রীমতীকে।

—আর ব্যাঙ্কে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকা চাই। পাস

বইটা আমার নিজের চোখে একবার দেখা প্রয়োজন। ব্যস, আমার আর বলার কিছু নেই। এবার আপনাদের কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

—বলার অবশ্য তেমন কিছু নেই। কারণ, অবিনাশের পক্ষে আপনার দাবীগুলি এতই তুচ্ছ যে, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। শেষের দিক থেকেই শুরু করি। আপনার দাবী—অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকা চাই। পাস বইটা আপনাকে দেখানো ঠিক হবে কিনা জানি নে, তবে এটুকু ভরসা দিতে পারি যে, আপনার প্রত্যাশা ছাপিয়ে ইতিমধ্যেই অবিনাশ আরো অনেক—অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাছাড়া লাখকয়েক ব্ল্যাক-মানিও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। আর বাড়ি! বাড়ি ওর একটা নয়, মোট পাঁচটা. তার মধ্যে তিনটাই রয়েছে বেনামীতে। আর একই মডেলের গাড়ি অবিনাশ সরকার কোনদিন পুরো একমাস চালিয়েছে, এমন অপবাদ বোধহয় ওর শত্তুরেও দিতে পারবে না।

—বলেন কি! রাশি রাশি উৎসাহ ঝরে পড়ল শ্রীমতীর কণ্ঠে।

—হ্যাঁ, তাই। আর বাবা-মা-ভাই-বোনদের ঝুট-ঝামেলা থেকে অবিনাশ চিরদিনই মুক্ত। সন্তান বলতে ঐ একটিই। আর বাবা-মাও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন বহুকাল আগেই :

—হাউ লাভলী! উৎসাহে কলকল করে উঠল শ্রীমতী, তাহলে আমি আমার ফাইনাল ওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি।

—উঁহু, এখন নয়, একটু পরে দেবেন। ওরও কয়েকটা বিশেষ হবি আছে, যা আপনার জানা উচিত।

—দরকার কি? বাধা দিয়ে বলল মিস হালদার, আমি তো আমার ওয়ার্ড অলরেডি দিয়েই দিয়েছি!

—তা দিন, তবু ওর বিশেষ হবিগুলোর কথা আপনার জানা উচিত। নিজের দাবী-দাওয়ার কথা সবই যখন বলেছেন, তখন ওকেও ওর কথা বলতে দেয়া উচিত।

—বেশ, ওর কি-কি হবি আছে বলুন? একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল মিস হালদার।

—আপনার মত ওরও বিশেষ হবি হল, এমন মেয়েকে বিয়ে করা, যার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ থাকবে না। ওসব ঝুট-ঝামেলা বরদাস্ত করতে ও একেবারেই নারাজ।

—সেকি! নিবিড় সংশয় দেখা গেল শ্রীমতীর চোখে-মুখে, আমার যে বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই রয়েছে! ওরা তাহলে কোথায় যাবে?

—ওদের পট্‌পট্‌ করে মরে যেতে বলুন।

—তার মানে! শ্রীমতীর দুচোখে ঘোর ঘোর দৃষ্টি, কি বলতে চাইছেন আপনি?

—অতি সোজা কথা। অবশ্য বাবা-মায়েব জন্যে ভাবনা নেই। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা মরে যেতে খুব একটা আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। আর ভাই-বোন! এ তো অতি সোজা ব্যাপার। সে দায়িত্ব আমার। বলুন কি চান? পটাসিয়াম সায়ানাইড, না বোমা? দু'চারটে ভাই-বোনের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে হলে এর কোনটাই খুব একটা খারাপ জিনিস নয়।

—এ-এ-এসব কি বলছেন আপনি! কটমট করে চোখ তুলে তাকাল শ্রীমতী।

—ঠিকই বলেছি। বাবা-মা, ভাই-বোন যখন কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়, তখন তাদের মেরে ফেলা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বলুন? হ্যাঁ, আরো কয়েকটা হবি আছে অবিনাশের। এ-গুলোও আপনার জানা দরকার।

—কি? সংশয়ভরে তাকাল মেয়েটি।

—আপনার বার্থ সার্টিফিকেটটা দাখিল করতে হবে। মানে আসল বয়েসটা···

—হোয়াট! অচমকা ফুঁসে উঠল শ্রীমতী, আপনি ভেবেছেন

কি আমাকে? মনে রাখবেন, আমি একজন গ্র্যা...ছ? সোসাইটিতে আমার দস্তুরমত একটা সম্মান আছে। এসব ক... আপনি···

—না, বেশি কথা আর বলব না। আর একটা পয়েন্ট মাত্র বাকি। শুধু বার্থ সার্টিফিকেট নয়, ঐ সঙ্গে আপনার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিটাও একবার দেখাতে হবে।

—কি! নিমেষে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শ্রীমতী, এতবড় সাহস আপনার! আপনি···আপনি···

—আমার নাম বহুরূপী। সিনেমা জগতের বহুরূপী।

—ব-ব-বহুরূপী! নিমেষে মাথাটা ঘুরে উঠল শ্রীমতীর, মাই গড্! ওঃ! যাক, অনেক হয়েছে, আর নয়। আমি যাচ্ছি··

যাচ্ছি মানে! হোটেলের বিল দেবে কে? কেবিন বুক করে অর্ডার দিয়েছিল কে? আপনি, না আমরা? তাহলে পেমেন্ট না করেই কেটে যাচ্ছেন কোন্ মুখে?

বাড়ি ফিরে এলাম আরো খানিক বাদে। একটা কিল্‌বিল্ ঘৃণায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত তখন গুলিয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। এই কি সেই রমণীর সংজ্ঞা? এই কি তার বাস্তব রূপ?

পাশাপাশি আর একটা ছবি। ছবিটা ডুয়ার্সের ...শবাড়ি চা-বাগানের সেই যূথিকা গাঙ্গুলীর, যার কথা আমি লিখেছিলাম পুজো সংখ্যা বহুরূপীর দপ্তরে। যূথিকাও গ্র্যাজুয়েট, যদিও সেকথা তার মুখ থেকে আমি কোনদিনই শুনিনি, শুনেছিলাম অন্য একজনের মুখ থেকে। যূথিকা লিখেছে:

'দাদাভাই, তোমার আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। সত্যিই আমি খুব সুখী হয়েছি এই নতুন সংসারে এসে। আমার শ্বশুরমশাই এবং শাশুড়িঠাকরুণ যে কি ভাল লোক, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমাকে খুবই ভালবাসেন

ওঁরা। আশীর্বাদ করো, আমি যেন জন্মে জন্মে এমন শ্বশুর-শাশুড়ি পাই।

দেবর অসীম আর পুলকের তো তুলনাই হয় না। আর একটা খবর জানাচ্ছি তোমাকে। বলতে লজ্জা হচ্ছে, তবু শুনলে তুমি খুশি হবে, তাই বলছি। অসীম ও পুলকের দাদাও খুব ভাল লোক।'

পাশাপাশি দুটি ছবি। কোন্‌টা সত্য? কোন্‌টা সুন্দর? কোন্‌টা কাম্য? বিচারের ভার আপনাদের ওপর।

কাতিক, ১৯৭০।

ধ্যাত্তরি তোর সংসার! নিকুচি করেছি এ সংসারের!

জামাটা গায়ে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে পড়লাম। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। দরকার হলে আফিম খাব। সন্ন্যেসী হয়ে যাব। তবু সংসার আর নয়।

তাহলে খুলেই বলি কথাটা। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সবেমাত্র পুজোর ফিচারটা নিয়ে বসেছি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল সেই সুধামাখা কণ্ঠের ঝঙ্কার, নেকক! ঘুম থেকে উঠেই নেকা নিয়ে বসা হয়েছে! এমন পুরুষের ঘর করার চাইতে গঙ্গায় ডুবে মরাও ভাল ছিল।

কান দিলাম না। পুরুষ মানুষকে এসব কথায় কান দিলে চলে না। এত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু আমি কেন, হাজার টাকা মাইনের হাঁজব্যাগুদেরও এ অপবাদ থেকে রেহাই নেই।

—বলি, বসে বসে এসব ছাইভস্ম নিকলেই চলবে, না কি ক্ষেমা-ঘেন্না করে সংসারের দিকে একটু তাকাবে? ঘরে যে একফোঁটা

বেবীফুড' নেই, মুখপোড়া মিন্সের সেদিকে কি কোন খেয়াল আছে? বাচ্চাটাকে এখন আমি কি খেতে দেব, শুনি?

ও হরি! এই ব্যাপার! তা বললেই তো হয়। এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম।

হায় ভগবান! কোথায় বেবীফুড! হাজার তেল মেখেও কোথাও বেবীফুডের দর্শন পেলাম না। কি সরকার, কি দোকানদার, সবাই আজ পাবলিকের উপকার করতে ব্যস্ত। তাই অন্যান্য কণ্ট্রোলজাত জিনিসের মত বেবীফুডও আজ ডানা মেলে উড়ে গেছে।

মনের আনন্দে ফিরে এলাম। যাক্, টাকাটা বেঁচে গেছে।

ব্যস. হয়ে গেল। শুরু হল বাপ-বাপান্ত। নিজে তো বটেই, আমার চৌদ্দপুরুষও বুঝি সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়ে গেল।

দেখা গেল, সব দোষ আমার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত ঘরের মেয়েছেলেটিরও ধারণা যে, বেবীফুড সর্বত্রই পাওয়া যায়। আসলে আমিই শক্রতা করে কিনছি নে। শুধু বেবীফুড কেন, চাল-চিনি-মাছ-নুন ইত্যাদি সবই নাকি অঢেল এবং যত্রতত্র পাওয়া যায়। নইলে ও-বাড়ির ঘোষালমশাই আনছে কি করে! কই, তার সংসারে তো কোন জিনিসের অভাব হয় না!

যুক্তি অকাট্য। সামান্য দেড়শো টাকা মাইনের সরকারী ইনস্পেকটর হয়েও ঘোষালমশাই খাস কলকাতা শহরে বাড়ি করেছেন। বিশ হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছেন। এমনি আরো অনেক কিছুই করেছেন। কেবলমাত্র যোগ্যতা ও প্রতিভার জোরে যিনি এতটা করতে পেরেছেন, তিনি যে সামান্য চাল-মাছ-তেলের সুরাহা করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি! তার চাইতে অনেক বেশি মাইনে পেলেও সে যোগ্যতা আমার কোথায়!

সুতরাং সব দোষ আমার। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে—আমার দোষ।

বড্ড গরম পড়েছে—আমার দোষ। এবেলা ঠিকে-ঝি আসেনি—আমিই তাব জন্য দায়ী। চাল পাওয়া যাচ্ছে না—সে আমারই দোষ। তেল নেই—তাও আমারই চক্রান্ত। বেবীফুড নেই—সে তো তাকে জব্দ করার জন্য আমার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, সংসারের প্রতিটি ঘরে আজ এই একই অভিযোগ। যেন তেনাদের জব্দ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একমাত্র ব্যতিক্রম অজয় মুখার্জী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন প্রমুখ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিগণ। বিয়ে-শাদী না করে খুব বেঁচে গেছেন ওঁরা। নইলে আজ এই অপবাদ থেকে ওঁরাও বোধকরি রেহাই পেতেন না। বিরোধী দলের নোটিসের মত ঘরেও যে ওঁদের মিনিটে মিনিটে এমনি করেই 'গঙ্গায় ডুবে মরব' বলে নোটিস পেতে হত—সেকথা অবধারিত।

বস্তুত, আমার মত মুখপোড়া মিন্‌সেদের সংসারে আজ বুঝি অপবাধের আর অন্ত নেই। দুনিয়াতে সবাই ভাল। ঘোষালদিদিব মিন্‌সে ভাল, সেজদির মিন্‌সে ভাল, রেবাদির মিন্‌সে ভাল, অমুকে ভাল, তমুকে ভাল—খারাপ শুধু নিজের মিন্‌সেটি। তারই বিজ্ঞপ্তি চলে মেয়েমহলের সর্বত্র,—কি বলব দিদি, এমন বোকা আর আমি দেখিনি! বোকা পেয়ে সবাই ঠকিয়ে নেয়, তবু এতটুকু হুঁশ নেই লোকটার!

শুনেও শুনিনে। কি লাভ শুনে! বলুক। আত্মতৃপ্তির এই তো একটি মাত্র পথ। মিন্‌সেব তুলনায় নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করে যদি সুখ পায় তো পাক না!

বলেই যদি রেহাই দিত তবু না হয় রক্ষে ছিল। কিন্তু সে যে কিছুতেই হবার নয়। আসল কারণটা যে মিশে রয়েছে দেহের প্রতিটি অস্থি-মজ্জায়। সেটা হল—পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই। ওদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। একটু সুবিধে পেয়েছে কি ব্যস! সুতরাং সব সময়ে ওদের রাখতে হবে চোখে চোখে।

ফল হয়েছে মারাত্মক। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ শোনা গেল সতর্ক শাসন, বলি জানালা দিয়ে তাকিয়ে কি দেখা হচ্ছিল, শুনি? ইচ্ছে করে চোখের মধ্যে পোড়া কাঠ গুঁজে দিই।

বুঝুন একবার। বাহাত্তুরে বুড়ো আমি, চব্বিশটি কাচ্চাবাচ্চার বাপ, আর এখনো কিনা একটু নিশ্চিন্তে বসবাস করবার উপায় নেই! তবে শুধু একজনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই দাদা। এ ব্যাপারে সংসারের সমস্ত মিন্‌সেদের ভাগ্য বুঝি একই সূত্রে গাঁথা। কারো রেহাই নেই এ হেন দুর্গতি থেকে।

এই মাসখানেক আগের কথাই ধরুন। দিন-রাত্রি সর্বক্ষণ তখন শুনছি,—ভারি তো সংসার! এই যে রাবণের গুষ্টির জন্য খেটে খেটে গায়ে-গতরে শেষ হয়ে গেলাম, সেদিকে কি কারো খেয়াল আছে! কেউ জিজ্ঞেস করে একবার! তাহলে কিসের জন্য এই সংসার! তার চাইতে বাবার ওখানে গিয়ে হাত-পা জুড়িয়ে একটু ঠাণ্ডা হব---সেই ভাল।

জবাব দিইনি। ইচ্ছে করেই দিইনি। হঠাৎ একদিন মনে হল, তাই তো! রোজ রোজ সংসারের এই ঘানি টানা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশ্রাম আর পেল কবে! তার চাইতে বরং ঘুরেই আসুক দিন কয়েকের জন্য।

বললাম, বেশ তো, যেতে চাও তো যাও। বল কবে যাবে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তার মানে! সঙ্গে সঙ্গে উল্টো বুঝলি রাম, আমাকে এখান থেকে সরাবার জন্য হঠাৎ এত দরদ কেন, শুনি? বুঝেছি। তলে তলে তাহলে একটা কিছু মতলব আঁটা হয়েছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি। চেনে না তো পদির মাকে। এই আমি বসে রইলাম। দেখি, কে আমাকে এখান থেকে এক পা নড়ায়! কার এতখানি হিম্মত যে, আমি থাকতে এ সংসারে এসে পা দেয়! ঝাঁটা মেরে সে রাক্ষুসীটার বিষদাঁত ভেঙে দেব না!

ব্যস, হয়ে গেল। প্রতিবাদ করাও বৃথা। কারণ, গলার স্বর তাতে ক্রমশ চড়বে ছাড়া নামবে না। সুতরাং মানতেই হল যে, হ্যাঁ, তলে তলে সত্যই আমার একটা মতলব ছিল। নেহাত তিনি খুব জবরদস্ত মহিলা—তাই আমার চালাকিটা আর খাটল না।

মাঝে মাঝে এ নিয়ে মজাও মন্দ হয় না। এই তো বছর কয়েক আগেকার কথা। মহামান্যা ইংলণ্ডের রাণীর আগমন উপলক্ষে সেদিন কলকাতার রাজপথ লোকে লোকারণ্য। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু কালো কালো মাথা। ভিড়ের মধ্যে আমিও রয়েছি। উদ্দেশ্য রাণীকে দেখা।

বাসায় ফিরে যেতেই প্রশ্ন হল, হ্যাঁগা, রাণীকে দেখতে কেমন গা?

বললাম, ঠিক রাণীর মতই দেখতে। আর বেশ সুন্দরী।

ব্যস, শ্রীমতী গম্ভীর। মুখে আর একটি কথাও নেই। ভয় পেয়ে গেলাম মনে মনে। কি ব্যাপার? হঠাৎ কেন এই নিঃশব্দতা? এমন তো বড় একটা হয় না!

জবাব পেলাম পরে। যাকে বলে একেবারে মুখের ওপর জবাব। কেন, এখন কেন? সুন্দরী রাণী, না কে—তার কাছে গেলেই তো হয়!

বুঝুন ঠেলা! কাকে কি বলব! কাকে বোঝাব! বোঝালেই কি বুঝবে! আপনারাই কি কোনদিন পেরেছেন বোঝাতে! কি করে পারবেন! যে অবুঝ, তাকে বোঝানো যায়, কিন্তু বুঝবে না বলে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের সে চেষ্টা করাও বৃথা।

তবে মিথ্যে বলব না দাদা, মনে মনে সেদিন একটু আত্মপ্রসাদই লাভ করেছিলাম। বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েই যে আমার জন্য হা-পিত্যেস করে বসে আছে, সে তো কবে থেকেই শুনে এসেছি। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরীও যে তাদের দলে রয়েছেন, সে খবর আমার জানা ছিল না।

যাক, যে কথা বলছিলাম। বেবীফুড না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেই আবার লেখাটা নিয়ে বসে গেলাম। আর মাত্র একটা দিন বাকি। কাল বারোটার মধ্যে লেখাটা পৌঁছে না দিলে তখন ঠেলা সামলানো দায় হবে।

কোথায় লেখা! সবেমাত্র কলমটা হাতে নিয়েছি, অমনি আবার শোনা গেল সেই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী, বলি নেকা নিয়ে থাকলেই চলবে! বাজার-টাজার করতে হবে না?

তাই তো! মনেই ছিল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম থলেটা হাতে নিয়ে। পেছন থেকে শোনা গেল আবার সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর, ছেলেপিলেগুলো আজ একমাস হল মাছের মুখ দেখেনি, তা যেন মনে থাকে।

কোথায় মাছ! বাজার শূন্য। অগত্যা নিত্যকার মতই বাসায় ফিরে এলাম শাক-সব্জী বোঝাই করে।

আর যায় কোথায়! সে কি কণ্ঠ। সে কি ঝঙ্কার! সে কি চেহারা! বারুদে আগুন ধরেছে যেন। এর নাম বাজার! এর চাইতে ছাই খাওয়াও ভাল। আজ থেকে তাই খেতে দেব। পইপই করে বলে দিলাম যে, ছেলেপিলেগুলো মাছ না হলে…

—চেষ্টা তো করেছি। চিঁচিঁ করে বললাম, কিন্তু না পাওয়া গেলে…

—ঝাঁটা মারি অমন পুরুষের মুখে! সবাই কেমন দিব্বি নিয়ে আসছে, আর বেহায়া পুরুষটা বলছে কিনা বাজারে মাছ নেই! মুখ ক্ষয়ে যাবে এই বলে দিলাম।

—আহা-হা, কথাটাই শোন না! বিশ্বাস কর…

—ওরে আমার বিশ্বাসী পুরুষ রে! অমন বিশ্বাসের মুখে আগুন! বলি, মাছ না পাওয়া গেলে ও-বাড়িতে মাছ এল কি করে?

—কি মুশকিল! আমি অনেক করে খুঁজে দেখেছি…

—থাক থাক! কার কত হিম্মত আমার জানা আছে। অমন লম্বা জিব বের করে আর স্বোয়ামীগিরি ফলাতে হবে না। মাগ্-ছেলেকে যে খাওয়াতে পারে না, সে স্বোয়ামী থাকার চাইতে না থাকাও ভাল।

আর একটি কথাও না বলে বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম। এই কথা! এমন স্বোয়ামী না থাকলেই ভাল! ঠিক হ্যায়। আজ থেকে আমি নেই। রইল তোমার এই ঘরদুয়ার, ছেলেপিলেদের নিয়ে থাক।

হন্‌হন্ করে এগিয়ে চললাম কোনদিকে দৃকপাত না করে। সারা মনে শ্মশান-বৈরাগ্য। সংসারে কে কার! কার জন্য এ-সব! কিসের জন্য এত মায়া! না, আব কোন কথা নয়। এবার আমার ছুটি।

—এই যে দাদা! সহসা একগাল হেসে সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রতিবেশী অনন্তবাবু, আজ কি মাছ পেলেন?

—মাছ! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম অনন্তবাবুর দিকে। কিসের মাছ!

—আর লুকিয়ে লাভ নেই দাদা। কাল বৌদি গরীবের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। তাঁর মুখে সবই শুনেছি। কত সুখ্যাতি করলেন আপনার। বললেন, 'বাজারে মাছ থাক, আর নাই থাক, ও ঠিক ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে। একদিনও তার কামাই নেই। এই তো আজো চার কিলো ওজনের একটা পোনা নিয়ে এসেছে।' আমার স্ত্রী আমাকে এই নিয়ে পরে কত কথা শোনালে।

আবার হনহন্ করে এগিয়ে চললাম। যত্তো সব! সারামাসের মধ্যে মাছের দেখা নেই, আর ওদিকে কিনা রোজ মাছ খাবার গল্প! যাক, মরুক গে! আমার কি!

—এই যে! পালাচ্ছেন কোথায়? খানিকদূর যেতে না-

যেতেই এবার কাছে এসে দাঁড়ালেন আর এক প্রতিবেশী ভজহরিবাবু, মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে বলুন? সব তো শুনে ফেলেছি।

—মিষ্টি! আমি অবাক। কি ব্যাপার? কিসের মিষ্টি? কি শুনেছেন?

—কাল আপনার স্ত্রীই আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন। লেকের কাছে আট কাঠা জমি নিয়েছেন, এ তো সুখের কথা। বাড়িও তো প্রায় শেষ করে এনেছেন শুনলাম। তা গৃহপ্রবেশ করছেন কবে?

—শীগ্‌গিরই। কথাটা বলে একরকম জোর করেই এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। হুঁঃ। বাড়ি না আরো কিছু! মাসের শেষে ধার-কর্জ না করে এক পা যার চলবার যো নেই, তার আবার বাড়ি। তাও কিনা আবার লেকের পাশে! কিন্তু কেন? এসব কথা বলে ওর লাভ কি?

আবার এগিয়ে চললাম। কি হবে শুধু শুধু এসব কথা ভেবে। আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসারের তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তির কথা চিন্তা করা আমার সাজে না। আমার পথ আলাদা।

কিন্তু যাবার কি আর যো আছে! এবার উদয় হলেন আর এক প্রতিবেশী হৃদয়হরণবাবু।

—এই যে! আপনাকেই খুঁজছিলাম! অ্যা.. ন ধরে পাশা-পাশি রয়েছি, কিন্তু এভাবে যদি শত্রুতা করেন, তাহলে তো আর থাকা যাবে না ভাই!

—কেন, কি হল? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—হতে কি আর বাকি রয়েছে! পুজোয় গিন্নীকে বারো ভরি সোনা দিয়ে নেকলেস গড়িয়ে দিয়েছেন, এ তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু উনি যদি এসব কথা বাড়ির মেয়েদের কানে তুলে দেন, তাহলে আমাদের মত ছাপোষা লোকদের অ হাটা কি দাঁড়ায়, একবার ভেবে দেখুন! শুনে অবধি ঐ তো মুখভার করে বসে আছে। এখন আমি কি করে সামলাই বলুন?

জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। নিজের ওপরই কেমন যেন সন্দেহ হল। আমি বেঁচে আছি তো। উঁহু, বোধহয় নেই। নইলে নেকলেস তো দূরের কথা, পুজোয় সামান্য একটা মোটা মিলের শাড়ি ছাড়া আর কিছুই যাকে দিতে পারিনি, তার মুখে একি অবিশ্বাস্য কথা।. কিন্তু কেন? কেন ওর এই কল্পনা-বিলাস? কেন ও নিজের কল্পিত ঐশ্বর্যকে সর্বসমক্ষে এমন শাখায় শাখায় পল্লবিত করে তুলতে চায়?

সর্বশেষে অস্ত্রটি ছাড়লেন পাড়ার সার্বজনীন মাসীমা। প্রতিটি অন্দরমহলে তাঁর অবাধ গতি। কি ছোট, কি বড়, সবার তিনি মাসীমা। আরো খানিকদূর এগিয়ে যেতেই সহসা বিপরীত দিক থেকে সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন সেই মাসীমা।

—এই যে বাবা! আজ তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করব। নালিশ আছে তোমার নামে।

কেমন যেন খটকা লাগল মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কি ব্যাপার?

—কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। বৌমা তোমার কথা বলে কত দুঃখ করলে। বললে, 'ওর দিকে তাকাতে গেলেই বুকটা আমার হু-হু করে ওঠে মাসীমা। লোকটা সংসারের জন্য খেটে খেটে একেবারে আধখানা হয়ে গেল।' তা বাবা আমি বলছিলাম কি, বাড়ি-গাড়ি সবই যখন একে একে ব্যবস্থা হতে চলেছে, তখন এত মেহনত না করে এবার একটু বিশ্রাম করলেই তো পার। বৌমা তো বলতে বলতে কাল কেঁদেই ফেললে। শেষে আমি কত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করি।

মাসীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। অলস মন্থর গতি। বিচিত্র এই নারী-চরিত্র। ঘরে যে মুখপোড়া মিন্‌সেকে সে সর্বক্ষণ মনের সাধে বাপ-বাপান্ত করে তার চৌদ্দ-পুরুষের ঠিকানা ভুলিয়ে দিতে এতটুকুও ইতস্তত করে না, আবার

বাইরে তাকেই সে দশজনের মাঝে দামী করে তুলে ধরে মূল্যবান ঐশ্বর্যের মত। এই বুঝি ওদের সহজাত ধর্ম।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে কোথায়, কত দূরে এগিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল বজ্রপাতের শব্দে।

—বলি ব্যাপারখানা কি! কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি?

চমকে উঠলাম। একি! মাসীমার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এ আমি কোথায় চলে এসেছি!

—মুখপোড়া মিন্‌সের কাণ্ড দেখলেও গা জ্বালা করে। সেই কখন থেকে আমি খাবার নিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি, আর এদিকে কিনা কারো দেখাই নেই! বলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা হল কেন? বসে পড়লেই তো হয়! এরপর যখন ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে অসুখ করবে, তখন তো ভুগতে হবে আমাকেই।

সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত সুবোধ ছেলের মত ঝুপ করে বসে পড়লাম। কেন জানি মনে হল, ঐ কথাগুলোর মধ্যে শুধু গালমন্দই নয়, আরও কিছু যেন একটা লুকিয়ে আছে—যা চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

এবারের লেখা এখানেই শেষ। অন্তত আমি তাই করেছিলাম। কিন্তু প্রেসে গিয়ে দেখলাম যে, এখানেই শেষ নয়। আমার অজ্ঞাতসারে কে যেন আঁকাবাঁকা অক্ষরে আরো একটা লাইন জুড়ে দিয়েছে নিচের দিকে। লিখেছে:

"আমার নামে এসব কতা যে নিকেচে, তার মুকে আগুন।"

শারদীয়া সিনেমা জগৎ।

মনে রাখবেন, এবারের লেখাটি বহুরূপীর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কেউ গ্যাঁড়াফাই করতে চেষ্টা করেছেন কি ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাচ্।

ভাবছেন কি ব্যাপার! হঠাৎ বহুরূপীর এই সতর্কবাণী কেন? কারণ আছে। নইলে অহেতুক আপনাদের হুঁশিয়ার করতে যাব কেন বলুন?

তাহলে খুলেই বলছি। ব্যাপার হল—ছবি। ছবি করছি।

তবে বাংলা নয়, হিন্দী। মণিহারের হিন্দী।

কাস্টিং মোটামুটি কমপ্লিট। বড়ভাই সৌমিত্রর জায়গায় দিলীপকেই একটা চান্স দেব বলে ঠিক করেছি। ছোটভাই—রাজ কাপুর। বন্দনার ভূমিকায় বৈজয়ন্তীই ফাইনাল। অনেক খেল-টেল থাকবে কি না। ও ছাড়া ঠিক পারবে না।

অবশ্য তেমন ধরাধরি করলে উত্তমকেও একটা ছোটখাট চান্স দেব বলে ভেবে রেখেছি। হাজার হোক, বাংলাদেশের হিরো। ওকে হতাশ করাটা ঠিক হবে না। তা, একগাদা ডাক্তারের রোল যখন রয়েছে, তখন ভাবনা কি। ওখানে কোথাও ঢুকিয়ে দিলেই চলবে।

স্ক্রীপ্টও কমপ্লিট। ভেবেছিলাম একজন ভাল স্ক্রীপ্ট-রাইটারকে লিখতে দেব, কিন্তু বাংলাদেশে তেমন লোক আর কোথায়? তাই শেষ পর্যন্ত ওটা নিজেকেই করতে হল।

তবে খোল-নলচে সবই পালটে দিয়েছি। উপায় কি। শত হলেও সর্বভারতীয় ছবি। তার রীতিনীতিগুলো ঠিক রাখতে হবে তো। নইলে হিন্দীপ্রিয় দর্শকরা তা মানবে কেন?

শুনবেন নাকি খানিকটা? বেশ, শুনুন। তবে সবটা বলব না। জানেন তো নাইনের ব্যাপার। কোথা থেকে কে গ্যাঁড়া মেরে দেবে, কে জানে! তাই তো কপিরাইট করে রাখতে হল।

নায়ক-নায়িকার প্রথম দৃশ্যের কথাই ধরুন। কি ছিল বাংলা মণিহারে? হঠাৎ দার্জিলিঙের পথে নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের গাড়ি বিকল হল, অমনি কোথা থেকে একগাদা ছেলে নিয়ে বিশ্বজিৎ তার উপকার করার জন্য এগিয়ে এল।

উঁহু, চলবে না। আরো মশলাদার জিনিস চাই। সুতরাং আমি কি করেছি শুনুন।

দার্জিলিঙ মেল। এক কামরায় সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, ছায়া দেবী ও বিকাশ রায়। পাশের কামরায় বিশ্বজিৎ অ্যাণ্ড কোম্পানি। হঠাৎ সন্ধ্যা রায় গান শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে বিশ্বজিৎ গানের মধ্য দিয়ে তার জবাব দিল।

মাঝে মাঝে ইনসার্ট। দেখা গেল গাড়ির প্রতিটি যাত্রী গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে। এঞ্জিন-ড্রাইভার, গার্ড, চেকার কেউ বাদ নেই।

মজা হল গানের শেষের দিকে। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু নাচ, নাচ আর নাচ! এদিকে সঙ্গীদের নিয়ে বিশ্বজিৎ নাচছে। ওদিকে সন্ধ্যা রায় নাচছে। তার বাবা-মা নাচছে। কাকা নাচছে। যাত্রীরা নাচছে। গার্ড, চেকার, এঞ্জিন-ড্রাইভার—সবাই নাচছে।

সিনটা কেমন জমেছে বলুন? কোন বাঙালী চিত্র-নাট্যকারের মাথায় এসব আইডিয়া ঢুকবে কোনদিন? জন্মেও না। যাক, শুনুন।

গাড়ি কাশিয়াং এসে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্ধ্যা রায় ডাকল, এই চা। এখানে চা দিয়ে যাও।

এমন চান্স হিন্দী ছবির নায়ক ছাড়ে কখনো! তাই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ ছুটে গিয়ে বত্রিশটি দাঁত বের করে তার ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিল।

—দাম কত? চা খেয়ে সন্ধ্যা রায় ব্যাগ হাতে নিল।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ একখানা গান শুরু করল, যার ভাবার্থ

হল, দাম আমি চাইনে মেরে প্যায়ারী। আমি চাই তোমার দিল্। তোমার মহব্বত। ব্যস, শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তুজনের মহব্বত হয়ে গেল।

পরের দৃশ্য দার্জিলিঙ। বিশ্বজিৎ বেপাত্তা। হোটেলে কখন আসে, কখন যায়, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কাণ্ড দেখে রজতেশ, অর্থাৎ রূপক মজুমদার অ্যাণ্ড কোং ফায়ার। ভাবটা এই যে—তুমি ব্যাটা দিব্বি মজা করে হিরোইনের সঙ্গে মহব্বত করবে, আর আমরা শালারা শুকনো মুখে বসে বসে আঙুল চুষব। ওসব চলবে না। হয় শেয়ার দাও, নয়তো কিচাইন্ করব।

পরের দৃশ্য মাউণ্ট এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিতের ডুয়েট গান। হঠাৎ কোথা থেকে একপাল যুবতী মেয়ে এসে তাদের ঘিরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। নাচতে নাচতেই আবার একসময়ে তারা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। গান কিন্তু চলতেই লাগল।

গানের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ। কখনো হনলুলু, কখনো উত্তর মেরু, কখনো বা নায়গ্রা জলপ্রপাতের দৃশ্য। সব শেষে সুইমিং কস্টুম পরা অবস্থায় কাশ্মীরের ডাল লেকে। উপায় নেই। হিন্দী ছবিতে সুইমিং কস্টুম পরা অবস্থায় নায়িকার স্নানের দৃশ্য না থাকলে সে ছবি তুদিনেই ভক্কা হয়ে যাবে। সুতরাং এ দৃশ্য রাখতেই হবে।

সবশেষে আবার এভারেস্টের চূড়ায় এসে গান শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে ছুটে এল রূপক মজুমদার। আমাদের ফাঁকি দিয়ে এখানে কিনা এই ব্যাপার! চালাকি নাকি!

কিন্তু কি আশ্চর্য! সন্ধ্যা রায় কোথাও নেই। রূপক হতভম্ব। একটু আগেই তো দূর থেকে তার গান শোনা গিয়েছিল। তাহলে গেল কোথায় সন্ধ্যা রায়?

হতাশ হয়ে রূপক নিচে নামতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে

বিশ্বজিতের ওভারকোটের পকেট থেকে সন্ধ্যা রায় বেরিয়ে এসে আবার গান শুরু করে দিল।

ঘুরে দাঁড়াল রূপক। ঐ তো সন্ধ্যার গান শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে হাজির হল এভারেস্টের চূড়ায়। হ্যাঁ, এই তো সন্ধ্যা রায়। কিন্তু বিশ্বজিৎ! সে আবার কোথায় গেল? আশ্চর্য, কোথাও সে নেই। ব্যর্থ হয়ে রূপক আবার নিচে নামতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে এবার সন্ধ্যা রায়ের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল বিশ্বজিৎ। তারপরই দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল খিল খিল করে।

তবে রে! তীরের মত ছুটে এল রূপক। সেই কখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এতক্ষণ কিনা আমার সঙ্গে দিল্লাগী করা হচ্ছিল! দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি।

ব্যস, শুরু হল দুম-দাম—দুম-দাম। সে কি আওয়াজ এক একখানা ঘুসির! যেন বজ্রপাত হচ্ছে আর কি! অবশ্য অন্য সময় হলে এর পরিণতি কি দাঁড়াত বলা শক্ত। কারণ, লাশখানা রূপক মজুমদারেরও তেমন ফ্যালনা নয়।

কিন্তু এখানে সে ভিলেন। সুতরাং হার মানতে সে বাধ্য। হলও তাই। হঠাৎ বিশ্বজিৎ কড়া একখানা ঝেড়ে দিল ধাঁই করে। সঙ্গে সঙ্গে রূপক এভারেস্টের চূড়া থেকে একেবারে গিয়ে ছিটকে পড়ল তাদের দার্জিলিঙের হোটেলের প্রাঙ্গণে। পড়তেই হবে। ভিলেন যে!

আচম্বিতে কোথা থেকে মেশিনগানের শব্দ ভেসে এল—কট্ কট্ কট্ কট্। বিদেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করেছে। এভারেস্টের চূড়ায় তারা হিন্দুস্থানের দাবি মানতে রাজী নয়।

বিশ্বজিৎও কম যায় না। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ড্রেনপাইপের পকেট থেকে বের করল দুটি মেশিনগান। তারপরই দুজনে দুটি মেশিনগান নিয়ে সমানে উত্তর দিতে লাগল—কট্ কট্ কট্ কট্।

দেখা গেল অসংখ্য শত্রুসৈন্য ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে, কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ অক্ষত।

হঠাৎ একঝাঁক বিমান এসে বোমাবর্ষণ করতে লাগল এভারেস্টের চূড়ায়। ফলে, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়ের মেশিনগান দুটি কোথায় ছিট্‌কে পড়ল চোখের পলকে।

দেখতে দেখতে শত্রুর স্থলবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। তাদের একহাতে কামান, অন্যহাতে প্যাটন ট্যাঙ্ক। দূর থেকে তারা ক্রমাগত প্যাটন ট্যাঙ্কগুলোকে ছুঁড়ে মারতে লাগল বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়কে লক্ষ্য করে।

ধন্য হিরো! ধন্য হিরোইন! স্রেফ বরফের চাঁই ছুঁড়ে বিশ্বজিৎ একাই ত্রিশ-চল্লিশটা প্যাটন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে ফেলল চোখের নিমেষে। সন্ধ্যা রায়ও ঘায়েল করল গোটাকয়েক।

আরো এগিয়ে এল শত্রুবাহিনী। উপায়ান্তর না দেখে হঠাৎ সন্ধ্যা রায় একখানা গান জুড়ে দিল, যার ভাবার্থ হল, 'মরতে আমাদের কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমাদের মহব্বত বেঁচে থাকবে চিরকাল। তাকে কেউ মারতে পারবে না।'

ব্যস, হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুবাহিনীর কামানের মুখগুলি ঘুরে গেল অন্যদিকে। ভারত তাদের পয়লা নম্বর দুষমন হলেও হিরো-হিরোইনের মহব্বতকে এতটুকু অসম্মান করতে রাজী নয়। তাই গান শেষ হতেই আবার তারা যথাস্থানে ফিরে গেল সুড়্ সুড়্ করে। বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায়ও শৈলশহর দার্জিলিঙে ফিরে এল দিব্যি হাত-ধরাধরি করে।

অমন রাম প্যাঁদানী খাবার পরেও কিন্তু রূপক তখনো তার আশা ছাড়েনি। সন্ধ্যা রায়ের গলায় মণিহার দেখেই সে দৃঢ়ভাবে বলে উঠল, ডোণ্ট ফরগেট, আমি তোমার উড্‌বি হাজব্যাণ্ড। এভাবে অন্য কারো দেওয়া মণিহার পরাটাকে আমি অত্যন্ত ডিস্‌-লাইক করি।

—হোয়াট ! ফুঁসে উঠল সন্ধ্যা রায়, তু মেরা উড্‌বি হাজব্যাণ্ড ! আরে থুঃ ! বলেই সে হিন্দী ছবির নায়িকাদের রীতি অনুযায়ী এক খাব্‌লা থুঁতু ছিটিয়ে দিল রূপকের মুখে।

এক চোখ ছোট করে একমুহূর্ত তাকাল রূপক। তারপরই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল গম্ভীরভাবে। ভাবটা এই যে,—আরে যা যা ! বাপের টাকা থাকলে সংসারে কোনদিন হিরোইনের অভাব হয় না। অমন ঢের ঢের হিরোইন আমার দেখা আছে।

এবার এল বিশ্বজিৎ। মণিহার দেখেই সে একেবারে খচে ফায়ার, এ মণিহার তুমকো কোন্ দিয়া—জলদি বতাও।

—মাস্টারজী দিয়া। ভয়ে ভয়ে জবাব দিল সন্ধ্যা রায়।

—গোলী মার তেরা মাস্টারজীকো।

—এ তুম কেয়া বোলতা বিশ্বজিৎ। পহেলে মেরি বাত তো শুনো জী !

—চুপ রহ ধোকাবাজ লেড়কী ! কাহে এতনা রোজ হামকো ধোকা দিয়া ? বতাও, জলদি বতাও।

—লেকিন ও তো তুমহারা বড়াভাই, হামারা মাস্টারজী···

—চুপ রহ মাস্টারজীকা বাচ্চি ! বেইমান ! বেসরম ! ধোকাবাজ কাঁহাকা ! বলেই বিশ্বজিৎ হিন্দী ছবির নায়ক সুলভ বীরত্ব প্রদর্শন করে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিল সন্ধ্যা রায়ের গালে। তারপরই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল গট্ গট্ করে।

—মৎ যাও বিশ্বজিৎ। মৎ যাও। সিঁড়ির দিকে দুহাত বাড়িয়ে মনের দুঃখে একটি গান ধরল সন্ধ্যা রায়, আভি ম্যায় ক্যায়া করু—ক্যায়া করু—ক্যায়া করু ! দিল্‌মে চোট লাগাকে মৎ যাও মেরে প্যায়ারে···

এবার শেষ দৃশ্য। সৌমিত্রর ঘরে ঢুকেই বিশ্বজিৎ ফেটে পড়ল অশান্ত উত্তেজনায়, কাহে তুম হামারা লাভারকো মণিহার দিয়া—জলদি বতাও।

—তেরা লাভার! সৌমিত্র অবাক।

—হাঁ হাঁ, মেরা লাভার। বহুত দিনসে উনকো সাথ হামারা লাভ্ হ্যায়। আভি বতাও, কাহে তুম উনকো মণিহার প্রেজেন্ট কিয়া? বতাও জলদি! নেহি তো···

—খামোশ্! মু সামালকে বাত করো। নেহি তো···

—নেহি তো ক্যায়া করেগা? লড়াই করেগা? ঠিক হ্যায়। কাম্ অন্। বলেই সোর্ড খুলল বিশ্বজিৎ।

—এই বাত! ঠিক হ্যায়। কাম্ অন্। সৌমিত্রও এবার সোর্ড নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। রবি ঘোষ বাধা দিল, কিন্তু কোন কথাই সে শুনতে রাজী নয়। তার এককথা, পহেলে মেরা খানদান। মেরা ইজ্জত।

ব্যস, শুরু হল স্যাট্ স্যাট্ স্যাটা স্যাট্! স্যাট্ স্যাট্ স্যাটা স্যাট্। সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত মুখুজ্যের ইঙ্গিত পেয়ে অর্কেস্ট্রা পার্টি চড়া সুর তুলল—ঝম্-ঝম্-ঝমাঝম্ ঝম্-ঝম্-ঝমাঝম্।

এদিকে সন্ধ্যা রায় সমানে চেঁচাচ্ছে, সাবাস বিশ্বজিৎ, সাবাস! আচ্ছা করে একখানা ঝেড়ে দাও। ওদিকে রবি ঘোষও একই-ভাবে গ্যাস দিয়ে চলেছে, কোমরের নিচে স্যাট্ করে একখানা মেরে দিন স্যার। ঠিক এমনি করে। কায়দাটা ভঙ্গী করে দেখাল সে।

হঠাৎ সৌমিত্রর সোর্ডটা ভেঙে গেল। কিন্তু না, বিশ্বজিৎ এ-সুযোগ নিতে রাজী নয়। হাজার হোক, সে হিরো। তাই সত্যিকার হিরোর মতই সে আর একটি নতুন সোর্ড সৌমিত্রর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, লে ধর। আভি কাম্ অন্।

আবার সেই স্যাট্ স্যাট্ স্যাটা স্যাট্। তবে আর বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎ শক্ত আঘাত পেয়ে সৌমিত্র মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তবে মরল না। কারণ, এখনো মস্ত বড় একটা লেকচার বাকি রয়ে গেছে। ওটা শেষ না করে তার পক্ষে মরা সম্ভব নয়।

তাই দুহাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, বুদ্ধু! তু পহেলে নম্বর বুদ্ধু বিশ্বজিৎ। হাঁ, সাচ বাত। মণিহার হাম দিয়া। লেকিন ও তো তেরে লিয়ে দিয়া বিশ্বজিৎ, স্রেফ তেরে লিয়ে।

—মেরে লিয়ে! সাচ! বিশ্বজিৎ স্তম্ভিত।

—হাঁ, সাচ! রামজীকা কসম, হাম ঝুট বাত নেহি বোলতা।

—হায় রামজী! হায় ভগবান! এ ম্যায় ক্যায়া কিয়া? ক্যায়া কিয়া? হঠাৎ বিশ্বজিৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। সন্ধ্যা রায় ও রবি ঘোষও তার সঙ্গে যোগ দিল।

—ভাইয়া! মেরে প্যায়ারে ভাইয়া! কাঁদতে কাঁদতেই বিশ্বজিৎ বলল, তু মর যায়েগা তো ম্যায় ভি মর যায়েগা।

—দূর পাগল! দিব্বি হাসতে হাসতে সৌমিত্র উঠে দাঁড়াল। তারপরই বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়কে সস্নেহে কাছে টেনে নিল।

বিশ্বজিৎ অবাক। এ কি ব্যাপাব! তবে কি দাদাব গায়ে কোন চোট্ লাগেনি?

—বুদ্ধু কাঁহাকা! হাসতে হাসতে বলল সৌমিত্র, ও তো ম্যায় গুল্ দিয়া।

—গুল্! হঠাৎ বিশ্বজিৎ ড্যাং ড্যাং করে টুইস্ট নাচতে নাচতে মনের আনন্দে গান ধরল, 'ম্যায় গুল্‌কা রাজা, গুল্‌' রাণী, গুল্‌কী দুনিয়ামে…'

সঙ্গে সঙ্গে সৌমিত্র, রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায় টুইস্ট নাচতে নাচতে ধুয়া তুলল—হুই-হুই-হুই! গুল্‌কী দুনিয়ামে…

গান শেষ হতে-না-হতেই নেপথ্য থেকে ভেসে এল সমাপ্তি-সঙ্গীত:

'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা।'